মীনার শেষ ঠিকানা

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সমকাল প্রকাশনী
৮।২এ গোয়ালটুলি লেন
কলকাতা-৭০০০১৩

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

প্রীতিভাজনেষু

মীনার শেষ ঠিকানা

আজ ছাব্বিশ গড়িয়ে সাতাশে পা ফেলল মীনা দত্ত। খুব সকালে ঘুম ভাঙতে এ কথাটাই সবার আগে মনে পড়ল। চোখ মেলে চারদিকে তাকালো একবার। ছোট খুপরি ঘর। সামনে দরজা। উল্টো দিকে দেড় হাত প্রমাণ ছুটো জানালা। তার পাশেই মীনা দত্তর ছোট্ট শৌখীন শয্যা। শৌখীন বলতে চকচকে সিঙ্গল খাট, তার ওপর মোটা জাজিম, ডবল তুলোর নরম তোশক, ধপধপে চাদর, মোটা বালিশ আর পাশবালিশ, চকচকে সবুজ নাইলন নেটের মশারি। তার ওপর মাথা বরাবর সিলিং-ফ্যান।

গলির বাড়ির সারি সারি ঘরের মধ্যে এমন সাজানো গোছানো ছিমছাম ঘরও আর ছুটি নেই। খাট থেকে নামলে সামনেই দেয়াল-ঘেঁষা ছোটর ওপর সুন্দর ড্রেসিং টেবিল। আয়নার সামনে সাজানো হরেক রকমের নামী-দামী কসমেটিক্স। তার পাশেই ছোট্ট সুন্দর কাঠের সেল্‌ফ একটা। ওপরের তাকে ট্রানজিস্টার। বাকি ছুই তাকে ঘর সাজানোর কিছু বাছাই করা পুতুল আর কিউরিও। অন্য দিকে ছোট স্টীলের আলমারি, তার পাশের আলনায় কয়েকটা শাড়ি আর জামা-টামা। সেগুলোও কম দামের খেলো কিছু নয়। আলনার পাশে টুলের ওপর চকচকে নীল কাপড়ে মোড়া মাঝারি সাইজের চামড়ার স্যুটকেস। দেওয়ালের হুকে দামী ক্যামেরা।

তাকে দেখে গলির বাড়ির যে সমবয়সী বউগুলো আর আধবয়সী রমণীরা ঠোঁট বাঁকায় আর চোখ ঘোরায়, কখনো কোন অজুহাতে এই ঘরের মধ্যে এসে গেলে মনে মনে তারাও মেয়েটার ছিমছাম রুচির প্রশংসা না করে পারে না। আর বিয়ে হয়নি অথচ হলেই-হয় গোছের যে ক'টা মেয়ে এই গলির বাড়ির বাসিন্দা, তারা তো দস্তুরমত সম্ভ্রমের চোখে দেখে মীনা দত্তকে। ওদেরও প্রায় সকলেরই মনে-ধরা

ছেলে আছে একটা-আধটা। গলির বাইরে অর্থাৎ বয়স্ক-বয়স্কাদের চোখের আড়ালে তাদের ফিস্‌ফিস্ গুজগুজ লেগেই আছে। মেয়েগুলোর মুখ থেকে শুনেই হোক বা যে কারণেই হোক, আসতে যেতে এই ছেলেগুলোও শশব্যস্তে মীনা দত্তর পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ায়।

গলির বাড়ির এত ঘর বাসিন্দার মধ্যে শুধু মীনা দত্ত এক ঝলক আলোর মতো। যে যেমন দেখে। কারো চোখ করকর করে, কারো ধাঁধা লাগে, কারো হিংসে হয়, কেউ বা মুগ্ধ হয়।

কিন্তু গলির ঘর আর যা-ই হোক, গলির ঘরই। প্রকৃতির আলো-বাতাসের দাক্ষিণ্যের আশা বাতুলতা। তার ওপর দরজা বন্ধ করলে তো গুমোট গরম। জানালায়ও আঁটসাঁট পুরু পর্দা লাগাতে হয়েছে। মেনিমুখো ছোঁড়াগুলোকে বিশ্বাস নেই। আরো কম বিশ্বাস করে ওদের মাঝবয়সী বাপ-দাদাগুলোকে। ষোলো আঠেরো বিশ বছরের ছেলেগুলোকে তবু সহ্য করা যায়। ওদের চোখে ঘোর, বুকের তলায় অনেক রং। কিন্তু ওই বয়স্ক মানুষগুলোর মুখোশ-আঁটা হ্যাংলামি অসহ্য। অনেক রকমের উদ্ভট চিন্তা মাথায় ঘুরপাক খায় মীনার। এমনও ভেবেছে, হাত-পা বাঁধা অসহায় অবস্থায় ওকে দেখলে ওই ছোঁড়াগুলো হয়তো আঁকুপাঁকু করে বাঁধন খুলতে আসবে। কিন্তু ওই পুরুষগুলো নড়া-পড়া নখ-দাঁত নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়বে তার ওপর।

মাথার ওপর বনবন করে পাখা ঘুরছে, কিন্তু গুমোট বাতাসে গলা বুক ঘামে ভিজে গেছে মীনার। এই দিনটায় এই পৃথিবীতে এসেছিল মনে পড়তেই আর চোখ বোজা হল না। পাশের বড় জানালার দিকে তাকালো। পর্দার ওপর দিয়ে চার আঙুল আকাশ দেখা যাচ্ছে। ভোরের শুচিতা মাখা রং বাইরের। মগজে একটা অদ্ভুত জিজ্ঞাসার চিহ্ন পড়ছে মীনার।…ছাব্বিশ বছর আগের সেই দিনটাও কি এ-রকমই ছিল? নাকি ঘনঘটা দুর্যোগের দিন ছিল সেটা? পাশের খুপরি ঘরে বাবা আছে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেই জানা যেতে পারে। কিন্তু আসলে মীনা জানতে চায় না, নিজের মনে নানারকম উদ্ভট প্রশ্ন তুলে মজা পায়।

বিছানায় উঠে বসল আস্তে আস্তে। গায়ে ব্লাউজ বা ছোট জামা নেই। আস্ত শাড়ির আঁচলটা গলা-বুক বেড়িয়ে জড়িয়ে নিল। দু'চোখ তখনো জানালার পর্দার ওপরের ফাঁক দিয়ে বাইরের দিকে।.... পর্দাটা সরিয়ে ভালো করে তাকাবে সেদিকে? সাতাশ বছরের এই প্রথম দিনের সকালটাকে স্বাগত জানাবে? কিংবা অদৃশ্য কোন নিয়ামকের উদ্দেশ্যে প্রণাম?

অস্ফুট একটা গালাগাল বেরিয়ে এলো মীনার মুখ দিয়ে। এই সুন্দর মুখে অমন অশ্লীল আশালীন উক্তি কেউ কল্পনাও করতে পারে না। তার এই ঢলঢলে মুখ আর মিষ্টি মিষ্টি ডাগর চোখের দিকে চেয়ে কেউ ভিতর দেখতে পায় না। কেউ যন্ত্রণা দেখতে পায় না। ভিতরের হিংস্র দিকটা কেউ কল্পনা করতে পারে না।

কিন্তু মীনা দত্ত আর যা-ই করুক, কখনো নিজেকে ভোলায় না। আয়নার সামনে বসে নিজের সর্ব অঙ্গে চোখ বোলাতে বোলাতে মিটিমিটি হাসে যখন, তখনো না। তাই ঘুম থেকে উঠে বসেই সাতাশ বছরের এই প্রথম সকালটাকে অভিশাপ দিল, আর নিজের উদ্দেশ্যে একটা অশালীন কটূক্তি করল।

জন্মদিনে প্রণাম বাড়ির একজনকে ও করে থাকে অবশ্য। অভ্যেসে করে। মাথায় হাত রেখে সেও যখন আশীর্বাদ করে, মনে মনে ভেঙচি কাটতে ইচ্ছে করে মীনার। কিন্তু ওই একটি মাত্র মানুষের জন্য তার অপরিসীম মায়া আর অপরিসীম মমতা। সেই মানুষ পাশের ঘরের বাবা বিজন দত্ত।

ছাব্বিশ বছর আগে যারা তাকে এই পৃথিবীর আলো বাতাসের মধ্যে টেনে এনেছিল, তাদের একজন অবশ্যই মা। বছর ছয় আগেও বুক নিঙড়ে আর অস্তিত্ব নিঙড়ে সমস্ত ঘৃণা কারো মাথায় যদি উপুড় করে ঢালতে বলা হত, তাহলে তার সবটাই শুধু ওই মায়ের মাথায় ঢালা হত। ঢেলেছেও। এখন অবশ্য পুরুষও সমান ভাগীদার এই ঘৃণা আর বিদ্বেষের। কিন্তু সেদিন পর্যন্ত ও কল্পনায় যাকে অবিরাম জ্বলতে দেখত, পুড়তে দেখত, সে তার মা। ওই এক মায়ের জন্য

সমস্ত মেয়ে জাতটার প্রতিই ঘৃণা তার। আর ও মেয়ে বলেই বাবার কাছে কত সময় মাথা হেঁট। মায়ের নাম ছিল নাকি মায়া। মায়া দত্ত। কিন্তু মায়া শুধু স্নেহ মমতা নয়। অবিদ্যা, ছলনাও। সেই অবিদ্যা আর ছলনার আঘাতেই হয়তো বাবা পঙ্গু আজ। যতদিন শক্তি ছিল, আঘাত সয়েছে। তারপর ভেঙেছে।

মায়ের চেহারা কেমন ছিল কল্পনায়ও আসে না। সুন্দরী তো ছিলই। নইলে পুরুষের অমন কুৎসিত ভোগে লাগবে কেন? তা ছাড়া মা সুন্দরী না হলে বাবার যা চেহারা,- মীনার কাঠামো এ-রকম হবার কথা নয়। মাসিও বলে, সুন্দর মিষ্টি চেহারা ছিল মায়ের। মীনা নাকি অনেকটা মায়ের আদল পেয়েছে। তিন বছর বয়সে শেষ দেখা সেই মাকে ভাবতে পারবে কি করে? তবু দেখতে ইচ্ছে করে। তার কোন ছবি বা ফোটো বাবা ঘরে রাখেনি। থাকলে ভালো হত। মায়ের সেই মুখ তাহলে রোষের আগুনে পোড়ানো সহজ হত।

সেই একজন কে, বাবা আজও জানে না। কেউ বোধহয় জানে না। বিয়ের আগে একজনের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক ছিল মায়ের, পরে বাবা এটুকুই শুধু জেনেছে। এই বৃত্তান্তও বাবা কোনদিন মুখ ফুটে বলেনি ওকে। প্রমথ কাকার কাছে শুনেছে। ওই আর এক বিটকেল মানুষ প্রমথ কাকা। কাকা-ফাকা কিছু নয়, বাবার ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানির দালাল ছিল। বাংলা মদ পেটে পড়লে ওই লোক গলগল করে কথা বলে।

...বেঁচে থাকলে সেই মায়ের বয়েস এখন আটচল্লিশ উনপঞ্চাশ। পঁচিশ বছর বয়সে ঘর ছেড়েছিল। বেঁচে আছে নিশ্চয়। অনেক কাল বেঁচে থাক। জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাক। মাসিমা অবিশ্যি জোর দিয়েই বলে মা বেঁচে নেই। কাশীর মণিকর্ণিকার ঘাটে মায়ের দেহ চিতায় উঠেছে। এই এক কারণেই মাসির মতে মা ভাগ্যবতী। কিন্তু মাসির কথা এক বর্ণও বিশ্বাস করে না মীনা। ওর আট দশ বারো বছর বয়সেও মাসি বলেছে, মা নেই। তেরো বছর বয়সে সেই মাসি তার মাকে মণিকর্ণিকায় নিয়ে গিয়ে শুইয়েছে।

ইচ্ছে থাকলেও মাসিকে জেরার মুখে ঠেলে নিয়ে যেতে পারেনি মীনা। বেজায় রাশভারী মহিলা। অল্পেতে রেগে যায়। তার ওপর মাথায় ধম্মো-কম্মের ছিট। তার গুরুদেবই তার ইহকাল পরকাল। পুজো আচ্চা গুরু সেবা গুরু মন্ত্রের জপ ইত্যাদির কারণে মাসির সংসারেরও আঁট চেহারা দেখেনি কোনদিন। এ-হেন মহিলার পক্ষে পরপুরুষের সঙ্গে ছোট বোনের ঘর ছেড়ে চলে যাওয়াটা বরদাস্ত করা কঠিন। মায়ের প্রসঙ্গ উচ্চারণ করে জিভ অশুচি করতে চাইত না। তাই মাসির কাছে মা সর্বদাই মৃত। বেশি রাগ হলে আবার বাবাকেও ছাড়ত না। বলত, তোর বাবা পাজির পাঝাড়া একটা। এখন সব খুইয়ে পঙ্গু হয়ে ভালো মানুষ সেজে বসেছে।

বাবার দোষ কিছু থাকতেই পারে। কিন্তু মীনার ধারণা তার সবটাই মায়ের কারণে। একজনকে মন দিয়ে আর একজনের ঘর করতে এসেছে জানতে পারলে কার মাথার ঠিক থাকে? চোদ্দ পনেরো বছর বয়েস পর্যন্ত বাবাকে একটু-আধটু মদ খেতেও দেখেছে মীনা আর মাঝে-মধ্যে বেশি রাত করে বাড়ি ফিরতেও দেখেছে। কিন্তু মায়ের কথা ভেবে আবার এটুকু দোষ-ত্রুটি সে কখনো বড় করে দেখেনি।

উনিশ বছর বয়েস পর্যন্ত জন্মদিনগুলো একভাবে কেটেছে মীনার। মাসি বাইরে যেমনই হোক, ভিতরে ভিতরে বোনঝির প্রতি টান যে আছে সেটা অস্বীকার করতে পারবে না। মায়ের সঙ্গে নামের মিল আছে। নাম মমতা। মমতা চৌধুরী। মীনার ভুল হলেও এই দিনটা মাসির ভুল হত না। মেসোকে বা কোন মাসতুতো ভাইকে পাঠিয়ে ওকে বাড়ি নিয়ে যেত। কোনবার গয়না দিত মাসি, কোনবার বা খুব দামী শাড়ি। আর খাওয়া-দাওয়া ফুর্তির মধ্যে সমস্ত দিনটা কেটে যেত। লোকে কথায় বলে, মায়ের থেকে মাসির বেশি দরদ। কিন্তু মীনার বেলায় মাসির অনেকটা সেই রকমই হয়েছিল। মাসির মেয়ে নেই, তিন ছেলে। তাই মেয়ে বলতে মীনাই। মা ঘর ছেড়ে যাবার পর ন'বছর মাসির কাছেই ছিল।

তারপর কি যে হল জানে না। বাবাকে ডেকে মাসি ওকে তার কাছে গছিয়ে দিল।

এখন অবশ্য কারণটা আঁচ করতে পারে মীনা। মাসির বাড়ি ছেড়ে আসার সময় মীনা বারো ছাড়িয়ে তেরোয় পড়েছিল। তখন সকলে ফুটফুটে মেয়ে বলত ওকে। মাসতুতো তিন ভাইই ওর থেকে বড়। তারা সর্বদা খুনসুটি করত ওর সঙ্গে। সেটাই মাসির চক্ষুশূল হয়েছিল। হয়তো ভেবেছিল, যার মা এ-রকম তার মেয়ে কি রকম হবে কে জানে! হলপ করে বলতে পারবে-না, তবে এই রকমই ধারণা মীনার।

কিন্তু তার পরেও অনেক বছর ধরে মাসি তার জন্মদিন করেছে, বাড়িতে নিয়ে গেছে, ভালো ভালো খাইয়েছে, দামী দামী উপহার দিয়েছে। বিবেচনা করলে এই মাসির প্রতি সব থেকে বেশি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত মীনার। কারণ মাসি না থাকলে দিন অচল হত। হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করে শর্টহ্যাণ্ড আর টাইপরাইটিং শেখা দূরে থাক—খাওয়াও জুটত না। বাবার চাকরি নেই। প্যারালিসিসে শরীরের বাঁদিক প্রায় অসাড়। দু'বছর না যেতে হাতের পুঁজি শেষ। মাসি তখন প্রতি মাসে আড়াইশো টাকা করে পাঠাত। মাসতুতো ভাই মাসের গোড়ায় সে টাকা মীনার হাতেই দিয়ে যেত। বাবাকে কেউ বিশ্বাস করত না।

হায়ার সেকেণ্ডারি ভালো ভাবে পাশ করেছিল। ওর মাথা নেই এ অপবাধ কেউ দেবে না। মাসির ইচ্ছে ছিল, বি. এ, এম. এ পড়ুক। কিন্তু মাথা ছিল বলেই তাড়াতাড়ি উপার্জনের রাস্তা খুঁজেছিল মীনা। মেসো বেসরকারী কলেজের প্রফেসার। এমন কিছু বড় রোজগেরে মানুষ নয়। তার ওপর নিজের তিন-তিনটে ছেলে মানুষ করে তোলার দায়। এ অবস্থায় মাসে মাসে আড়াইশোটি করে টাকা কি করে ওদের সংসারে দেয় সেটাই আশ্চর্য। জন্মদিন বাদ দিলেও ওর সমস্ত বছরের ভালো ভালো জামা-কাপড়ের খরচও ওই মাসিই জুগিয়ে এসেছে।

মাসিকে অব্যাহতি দেবার তাড়নাতেই ফার্স্ট ডিভিশনে হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করা সত্ত্বেও সোজা শর্টহ্যাণ্ড-টাইপরাইটিং-এর স্কুলে গিয়ে ঢুকেছিল। ওই বয়সের আর পাঁচটা মেয়ের থেকে বুদ্ধি একটু বেশিই তার। সেই আঠেরো বছর বয়সে গলির আর গলির বাইরের বেশ বড় ঘরেরও ছেলে ছোকরাদের চন্‌মনে ভাব দেখে নিজের সম্পর্কে বেশ সুস্পষ্ট একটা ধারণা হয়ে গেছল। স্টেনো হবার পর মোটামুটি ভালো চাকরি একটা পাবেই ধরে নিয়েছিল। এ-বিদ্যেটা ভালো ভাবে রপ্ত হলে বাদ বাকি যাচাইয়ের ভার তো পুরুষের ওপর। বড় বড় ফার্মে সুশ্রী মেয়ে স্টেনোগ্রাফারের কদর পুরুষের থেকে ঢের বেশি। দিন-কালের হাওয়া যেমন। বড় কর্তাদের সুনজরে পড়ে কত মেয়ে কোথায় উঠে গেছে তার কিছু নজির ওর জানা আছে।

না, এ বিবেচনায় খুব ভুল হয়নি। শর্টহ্যাণ্ড পাশ করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এই মাসির সাহায্যেই দস্তুরমত ভালো মাইনের চাকরি হয়ে গেছল তার। এত ভালো সে কল্পনা করতে পারেনি। তখনই জেনেছে, কলেজের মাস্টার হলেও মেসোর বেশ ভালো ভালো কানেকশন আছে। অনেকেই কৃতী ছাত্র তার। মাসির তাড়নায় মেসোকে যোগাযোগ করে দিতে হয়েছে। আর তার ফলে এত সহজে অমন চাকরিখানা পেয়েছিল মীনা যে নিজেই অবাক রীতিমত।

...সে চাকরির পরিণাম বিষাক্ত। দেড় বছরের বেশি টিকতে পারেনি। চাকরিটির সঙ্গে আরো কিছু খুইয়েছে সে, বিশ্বাসের মাশুল গুণে দিতে হয়েছে। আর সেই সঙ্গে মাসিরও চক্ষুশূল হয়েছে। তবু ওই মেসোর দয়াতেই আবার একটা ভালো কাজ পেয়েছে। আর সেই সূত্র থেকেই এই জীবনের মোহনায় এসে পৌঁছেছে। এ ভালো কি মন্দ সে বিবেচনার ধার ধারে না এখন। কিন্তু মাসির তাগিদে মেসো যোগাযোগ না করিয়ে দিলে আজ যেখানে এসেছে তাদের পাত্তা যে মিলত না, এটা ঠিক।

তবু ভিতরের অনুভূতিটা বিচার বিবেচনার পথ ধরে চলে না খুব। এই মাসির প্রতিও কৃতজ্ঞতার ছিটেফোঁটা নেই মীনা দত্তর। এখন

ভাবে, মায়ের পাপের খেসারত মাসি দিয়েছে—এই পর্যন্ত। তার বেশি কিছু নয়। আসলে মায়ের দিকের সম্পর্কের কাউকে দেখতে পারে না। কাউকে বরদাস্ত করতে পারে না। বছর কয়েক আগে এক মামাতো ভাই মাঝে মাঝে এসে থাকত ওদের সঙ্গে এই গলির বাড়িতেই। মীনার থেকে বছর তিনেকের বড়। সে বাবু আবার উগ্র রাজনীতির দলে গিয়ে ভিড়েছিল। মীনা মনে মনে তাকে ভয় করত; তার থেকেও বেশি করত ঘৃণা। ভয় করত, এ-সব ছেলের ভিতরের বেপরোয়া কঠিন দিকটার আঁচ কিছু কিছু পেত বলে। আর ঘৃণার কারণ মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক। মায়ের ভাইয়ের ছেলে সেটাই তার মস্ত অপরাধ। অথচ সেই মামাতো ভাই সত্যি ভালোবাসত ওকে। তবু সেই ছেলে এখন জেলে পচছে। মীনার হাড় জুড়িয়েছে। মীনাকেও দলে টানার চেষ্টা ছিল তার। ওদের দলের কারো কারো সঙ্গে পরিচয়ও ছিল। তাদের মধ্যে এক আধজন মাতব্বরের একটু-আধটু দুর্বলতার আঁচও পেত।...ছ' বছর আগে এক চরম বিপর্যয়ের ফলে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে তাদের একজনের শরণাপন্নও হয়েছিল। তখন শুধু প্রতিশোধের আগুন জ্বলছিল মাথায়। নইলে মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে তার বন্ধুদেরও সমান বিষ নজরে দেখত মীনা।

মশারি সরিয়ে খাট থেকে মাটিতে নামল। এই দিনে ছ' বছর আগের একটা দিনের স্মৃতির চাবুক কাঁধ থেকে পিঠের দিকের ছ' আঙুল পর্যন্ত চিরে চিরে দিয়ে যাবেই। এই সাত সকালেও তাই তপ্ত গনগনে মুখ মীনা দত্তর।

পায়ে পায়ে আয়নার সামনের ছোট কুশনে গিয়ে বসল। বুক পিঠের কাপড় এমনিতেই স্রস্ত তখনো। টেনে সেটা আরো নামিয়ে দিয়ে আয়নার দিকে কাঁধ ফেরালো একটু। না, এখন শুধু পিঠের ওপর পাঁচ ছ' আঙুলের একটা সাদাটে দাগ ছাড়া আর কিছুই নেই। ওই সাদা দাগ এ জীবনে আর মিলাবে না।...ওই জায়গার চামড়া ফেটে দু' ফাঁক হয়ে গেছল। রক্তে দামী ব্লাউজের ও-দিকটা লাল

হয়ে গেছল। বাইরের ক্ষত শুকিয়েছে। একটা দাগ শুধু পড়ে আছে। কিন্তু ভিতরের ক্ষত জুড়বার নয়। আর ঠিক এই দিনে সেই আঘাতের আর সেই অপমানের যন্ত্রণায় নতুন করে খুন চাপে মাথায়। প্রতিশোধের নতুন শপথ নেয়।

শাণিত চোখে, আয়নায় নিজের দিকেই চেয়ে আছে মীনা দত্ত। নিজের অঙ্গশোভা দেখছে। ছাব্বিশটা বছর অনেকগুলো বছর। কেউ বয়েস জিজ্ঞেস করে না। কিন্তু করলে আজ সাতাশ বলতে হত। আরো সাত বছর বাদেও সেই সাতাশই বলতে পারবে মনে হয়। বয়েস শত্রু। এ-শত্রুকে কাছে ঘেঁষতে না দেওয়ার রাস্তা নিজের তাগিদেই বার করেছে। দস্তুরমত টাকা খরচ করে যোগ্য জায়গা থেকে দেহ-সৌষ্ঠব অটুট রাখার তালিম নিয়েছে। সকালে রোজ প্রায় ঘণ্টাখানেক যোগ ব্যায়াম-আসনে কেটে যায়। এ-ব্যাপারে আলস্য নেই। সৌষ্ঠব বছর বছর বাড়ছে বরং।

কিন্তু এই দিনটাতে আসনে বসে না। ইচ্ছে করে না। কারণ সকাল থেকেই মেজাজ খিঁচড়ে থাকে। পিঠের ওই দাগের যন্ত্রণা নতুন করে জ্বালা ধরায়। শিরায় শিরায় রক্ত ফোটে। এই মন নিয়ে যোগ-আসনে বসা যায় না।

....আজ এই মুহূর্তে নিজের দিকে চেয়ে চেয়ে ধারালো চোখে ঠিক যে নিজেকেই খুঁটিয়ে দেখছে মীনা দত্ত, তা নয়। ভাবছেও কিছু। কাঁধ-পিঠের ওই শাদা দাগটা ছ' বছর আগের এক জন্মদিনের উপহার বটে। কিন্তু সে খবর এখন এক ও ছাড়া আর কে রাখে। মাসি জানত। কিন্তু মাসির সঙ্গে গত চার বছরের মধ্যে মুখ দেখাদেখিও নেই। আর, প্রতিহিংসায় পাগল হয়ে মামাতো ভাইয়ের সেই এক মাতব্বর বন্ধুকে মুখে বলেছিল। সে-ও অনেক কাল এখন চোখের আড়াল, মনের আড়াল। মীনা খবর রাখে না, খুব সম্ভব সে-ও জেলেই পচছে এখন। নইলে ঠিক জ্বালাতন করতে আসত।...গত চার বছর ধরে এই দিনে তা বলে হৈ-হুল্লোড় কম হয় না। উপহারও কম আসে না ঘরে। এই শৌখীন ট্রানজিস্টার আর দেয়ালে

ঝোলানো ওই দামী ক্যামেরাটা জন্মদিনের উপহার হিসেবেই ঘরে এসেছে। পর পর দু' বছর এ দুটো দিয়েছে তার বর্তমান মুরুব্বি কমল গাঙ্গুলি। মীনার ছবি তোলার বাতিক দেখে দু' বছর আগের এমনি দিনে দরাজ হাতে নিজের দামী বিদেশী ক্যামেরাটা ওর গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছিল। যার ফলে মীনা দত্ত পাকা ফোটো তুলিয়ে মেয়ে এখন।

এই দিনে বাবাকে ছাড়া বাইরেরও জনা কয়েককে প্রণাম করে থাকে সে। তাদের মধ্যে একজনকে বাদ দিলে বাকি ক'জনের প্রণামে ভক্তি শ্রদ্ধার ছিটেফোঁটাও নেই। যেমন, কমল গাঙ্গুলি, আর সামনে এসে গেলে তার বউ রেবা গাঙ্গুলিকেও একটা করে প্রণাম ঠুকে ওঠে। কমল গাঙ্গুলির আগের মুরুব্বি অ্যাটর্নি বীরেন গুপ্ত, আর সামনে এসে গেলে তার বউ সোমা গুপ্তকেও প্রণাম করে। কমল গাঙ্গুলি আর তার বউয়ের বয়েস একত্রিশ আর চব্বিশ। বীরেন গুপ্ত আর তার বউয়ের বয়েস তেত্রিশ আর আটাশ। পায়ে হাত দিলে এরা সকলেই হাঁ হাঁ করে ওঠে। বড় বড় চোখ মেলে মীনা ওদের মুখের দিকে চেয়ে থাকে আর মিষ্টি মিষ্টি হাসে। শেষে একটু জোর দিয়েই বলে, অন্নদাতা···প্রণাম করব না তো কি!

এর ফলে বীরেন গুপ্ত আর কমল গাঙ্গুলির বউ দুটোর অন্তত এখন পর্যন্ত চোখে কোন রকম কাঁটার আঁচড় পড়েনি।

তবে ভক্তি-শ্রদ্ধা জানে না, মাথা একজনের পায়ে আপনি নত হয় তার। তিনি কমল গাঙ্গুলির কাকা সমর গাঙ্গুলি। বছর পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন হবে বয়েস। কালোর ওপর দস্তুরমত সুশ্রী মানুষটা। দীর্ঘাঙ্গ পুরুষ, এক মাথা কাঁচা-পাকা ঝাঁকড়া চুল। ঝকঝকে বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। গাঙ্গুলিবাড়িতে খুব কমই যাতায়াত মীনার। তবু গত কয়েকটা বছরের যোগাযোগের ফলে তার অনুমান, বিরাট বিত্তশালী বাপের সঙ্গে কোন কারণে বেশি রকম মনোমালিন্য ঘটে গেছল সমর গাঙ্গুলির। যার ফলে ভদ্রলোক বিয়ে-থা করেননি। নিজে চার্টার্ড অ্যাকাউণ্টেণ্ট। স্বাধীন ব্যবসায় প্রচুর রোজগার করেছেন। কাজ-

কর্ম ছেড়ে এখন শুধু বই পড়েন। সে-ও সাধারণের দাঁত ফোটাবার মতো বই নয়। বেদ উপনিষদ থেকে শুরু করে ইংরেজী, বাঙলা, সংস্কৃতে নানা রকমের আত্মতত্ত্ব আর দর্শনের বই।

ছ' বছর আগে প্রথম চাকরির সময় এই লোকের সঙ্গে সামান্ত পরিচয় ছিল মীনা দত্তর। তখন তাঁর ভাইপো কমল গাঙ্গুলি বা অ্যাটর্নি বীরেন গুপ্তর নামও জানা ছিল না তার। আশ্চর্য, এই বয়স্ক মানুষটাকেও তখন খুব একটা শ্রদ্ধার চোখে দেখত না সে। তাঁর স্নেহ দৃষ্টি বা গায়ে পড়া দুই একটা উপদেশ বরং এক ধরনের অস্বস্তিকর সংশয়ের কারণ হয়ে উঠত। এক শিক্ষাদীক্ষা ভিন্ন গলির এই বাড়ির মাঝবয়সী মানুষগুলোর সঙ্গে এই লোকের খুব একটা তফাৎ আছে, ভাবত না। প্রবৃত্তি একরকম হলেও মানুষ তো ঢের বেশি জোরালো। তাই সেই কাজের জায়গায় এই লোকের পদার্পণ ঘটলে একটু ভয়ে ভয়ে থাকত ও। সে ভুল অবশ্য ভেঙেছে অনেক দিন আগেই।

সমর গাঙ্গুলিকে প্রণাম করলে তিনি সোজা দাঁড়িয়ে থাকেন। পিঠে হাতও ছোঁয়ান না। স্বল্পভাষী মানুষ, কথা বলেনই না প্রায়। মুখের দিকে চেয়ে সামান্ত হাসেন। বুদ্ধিদীপ্ত ওই চোখ দুটো বড় স্নেহ মাখা মনে হয়। এই একটা প্রণামই সার্থক ভাবে মীনা।

....আজ জন্মদিন শোনার পর বীরেনদা অর্থাৎ অ্যাটর্নি বীরেন গুপ্ত কি করবে মীনা সেটা সহজেই অনুমান করতে পারে। খুশি হয়ে পিঠ চাপড়াবে। তক্ষুণি বড় কোন হোটেলে রাত্রিতে ডিনারের নেমন্তন্ন করবে। টেলিফোনে নিজের স্ত্রীকেও সন্ধ্যার পর সেই হোটেলে চলে আসতে বলবে। আর কমল গাঙ্গুলিকে তো বলবেই। দুজনে হরিহর আত্মা সম্প্রতি। কিন্তু বীরেন গুপ্ত মানুষটা চতুর। তার বাইরেটা দেখে ঠিক ভেতর বোঝা যায় না। মীনা অন্তত সঠিক বুঝতে পারে না লোকটাকে। তবু একে নিয়ে তেমন মাথা ব্যথা নেই ওর। তার স্ত্রী সোমাকে দিদি ডাকতে শুরু করার পর থেকে ফুর্তিবাজ মানুষটার জিভ আলগা হয়েছে আরো—এই পর্যন্ত।

....কিন্তু কমল গাঙ্গুলি কি করবে? আজও কি দামী উপহার দেবে কিছু? দেবে নিশ্চয়। অন্যান্য বারের থেকেও বেশি দামী কিছু হওয়া বিচিত্র নয়। খুব অল্প অল্প করে তার মুখোশ খুলছে। গত দেড় বছরে মীনা তার একান্ত অনুগত আর বিশ্বাসের পাত্রী হয়ে উঠতে পেরেছে বলেই খুলছে। এখন মীনা জোর দিয়ে বলতে পারে, নিজের বিশেষ কোন স্বার্থ সিদ্ধির কারণেই অ্যাটর্নি আপিসের দেড়া মাইনে গুণে বীরেন গুপ্তর কাছ থেকে তাকে ছাড়িয়ে আনা হয়েছে। মাইনেটাই সব নয়। এই লোকের সংস্পর্শে আসার পর থেকে কলকাতার উঁচু মহল আর অভিজাত মহলের অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে আসা সহজ হয়েছে। কমল গাঙ্গুলি এক নাম-করা সর্বভারতীয় সংস্কৃতি সংস্থার পূর্বাঞ্চলের স্থায়ী শাখা-কর্ণধার। নামে হোয়াইট টাওয়ার এই সংস্কৃতি সংস্থা এখন আন্তর্জাতিক সম্প্রসারণের পথে এগিয়েছে। কমল গাঙ্গুলি কলকাতাতেই থাকে বেশির ভাগ সময়। আবার প্রতিষ্ঠানের কাজে দিল্লী, বোম্বাই, লণ্ডনও করে বেড়াতে হয় মাঝে মাঝে। কারণ হোয়াইট টাওয়ারের সর্বভারতীয় কর্ণধারদেরও সে বিশেষ একজন এ-ছাড়া, এখানকার কয়েকটা নামী সেবা প্রতিষ্ঠান আর উঁচু মহলের বহু অনুষ্ঠানের সঙ্গে তার অবিচ্ছেদ্য যোগ। এক কথায় কলকাতার অভিজাত সমাজের সে জনপ্রিয় সদা-ব্যস্ত মিষ্টি মানুষ একজন।

তার চরিত্রের কয়েকটা বিশেষ গুণ মীনা গোড়া থেকেই লক্ষ্য করে আসছে। এই সব মানুষদের যে কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষে ফুর্তির প্রধান উপকরণ হল নামী দামী বিলিতি মদ। কিন্তু কমল গাঙ্গুলি মদ ছোঁয়া দূরে থাক, তাকে একটা সিগারেটও খেতে দেখেনি কোনদিন। বড় ঘরের বহু রূপসী মেয়ের সঙ্গে তার অবাধ মেলা-মেশা। কিন্তু মীনা খুব ভালো করেই লক্ষ্য করেছে, এদিক থেকেও লোকটা সত্যিই আসক্তি বর্জিত। তার দুটো চোখে এতদিনেও লোভের এতটুকু ছায়া দেখেনি কোনদিন। এদিক থেকেও লোকটার চরিত্র বিশ্লেষণে ভুল যে হয়নি তার নজির মীনা নিজেই। সে এখন

কমল গুপ্তর পার্সোনাল সেক্রেটারি আর প্রতিষ্ঠানের ওয়েলফেয়ার অফিসার। তার আগে একজন অ্যাংলো মেয়ে এই দুটো কাজে বহাল ছিল। মীনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট তার সহকারিণী হিসেবে, একটু বয়েসের দরুন হোক বা যে কারণেই হোক, সেই মহিলা চলে যাবার পরেই মীনাকে তার জায়গায় বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ-রকম একটা আশ্বাসও কমল গাঙ্গুলি ওকে আগেই দিয়ে বলেছিল—মিসেস 'জোন্স শীগগিরই চলে যাচ্ছেন, তখন তার জায়গায় তুমি আসছ।

কথার খেলাপ করেনি। মীনাকে মিসেস জোন্স-এর জায়গায় বসিয়ে দিয়ে তার জায়গায় অল্পবয়সী আর একটি সুশ্রী অবাঙালী মেয়ে আনা হয়েছে।

এই পদোন্নতির পর থেকে সকাল এগারোটা থেকে কোন কোনদিন রাত এগারোটা পর্যন্ত এই লোকের প্রায় সর্বক্ষণের সহচরী সে। তার সঙ্গে দিল্লী বোম্বাইও করেছে দুই একবার। কিন্তু আশ্চর্য, এ-যাবত কোনদিন এতটুকু বেচাল দেখেনি মানুষটার, এতটুকু প্রগল্ভ ইশারারও আঁচ লাগেনি গায়ে। অথচ হাসি-খুশি রসিক মানুষ। নিজের ঘরে মোটামুটি সুশ্রী স্ত্রী আছে, বাচ্চা ছেলেও আছে একটা। তবু, কাকা সমর গাঙ্গুলির নিরাসক্ত দিকটাই এই লোকের চরিত্রে প্রাধান্য পেয়েছে কিনা মীনা দত্ত ভেবে পায় না।

কিন্তু এ-সত্ত্বেও মীনার ধারণা, একেবারে অকারণে হুট করে তাকে এনে এ পোস্টে বসিয়ে দেওয়া হয়নি। প্রথমে চোখের মোহ ভেবেছিল। লোভ ভেবেছিল। দেখা গেল তা নয়।... তাহলে কি? বারোশ টাকার ওপর মাইনে তার এখন। লাঞ্চ ফ্রী। সপ্তাহের মধ্যে চার পাঁচ রাত ডিনারও ফ্রী। চিকিৎসাও ফ্রী, কারণ, চার পাঁচটা বড় বড় হাসপাতালে সংস্থা থেকে নিয়মিত মোটা ডোনেশন যায়। বাবাকে অনেক দিন একটা ভালো হাসপাতালের কেবিনে রেখে চিকিৎসা করা হয়েছিল। কোন ফল হয়নি অবশ্য, কিন্তু এক পয়সা খরচও হয়নি মীনার। সংস্থার অঢেল টাকা, ভালো মাইনের আরো অনেক কর্মচারী যুক্ত এর সঙ্গে। শহরের সমস্ত বড় বড়

শিল্পপতি, বড় বড় ডাক্তার আর ব্যারিস্টারের সঙ্গে যোগ এর। তাদের বদান্যতায় প্রচুর টাকা থাকাটা অসম্ভব কিছু নয়। তবু সময় সময় অবাক লাগে মীনার। তা বলে এত টাকা আসে কোথা থেকে? বারো মাস চ্যারিটির ছড়াছড়ি। আর এক একটা অনুষ্ঠানে ঢালাও খরচ। মীনার এখন কি রকম ধারণা, বাইরে থেকেও টাকা আসে। কেন আসে বা কোথা থেকে আসে এখনো ঠাওর করতে পারে না। মোট কথা হোয়াইট টাওয়ারের সব কিছুই সাদা মনে হয় না তার।

....গত কয়েক মাস ধরে মীনা যেন আরো প্রিয়পাত্রী আরো বিশ্বাসের পাত্রী হয়ে উঠেছে কমল গাঙ্গুলির। কথাবার্তা নেই, গত মাসে একশো টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছে। সংস্থার গাড়িতেই ইদানীং যাওয়া আসা করে সে। একটা গাড়ি তার জিম্মাতে ছেড়ে দেওয়া যায় কিনা, ভদ্রলোক এ চিন্তাও করছে এখন। তার সুখ সুবিধের খোঁজ নেই, ভবিষ্যতে আরো কত বড় হবার সম্ভাবনা তার—সে-কথা শোনায়।

দিন পনেরো আগে কমল গাঙ্গুলির আপিস ঘরে বসেই কি কাগজ-পত্র নাড়াচাড়া করছিল মীনা। হঠাৎ ঘাড় ফেরাতে মনে হল, লোকটা যেন বেশ নিবিষ্ট-চোখে দেখছে ওকে। পরে ঘাড় না ফিরিয়েও এই দেখার তন্ময়তা অনুভব করতে লাগল। অথচ এই দেখাটা স্থূল কিছু নয়। ওকে নিয়েই কিছু যেন একটা বিচার বিশ্লেষণ চলেছে লোকটার।

হঠাৎ ডাকল, মীনা, এদিকে শোন।

কাছে এসে দাঁড়াল।—বোস।

আচ্ছা, বীরেনদার অ্যাটর্নি ফার্ম থেকে এখানে টেনে এনে তোমার আমি উপকারই করেছি বোধহয় একটু?

চোখে চোখ রেখে সোজা তাকিয়েছে মীনা।—একটু না কতটা সেটা আপনাকে মুখে বলতে হবে?

হাসল।—বেশ, বুঝলাম। বলতে হবে না। তাহলে আমি বলতে পারি তুমি আমার প্রতি কৃতজ্ঞ?

শুধু কৃতজ্ঞ বললে সবটা বলা হবে না। সোজা তাকিয়ে সরল স্বীকৃতি জানানোর মাধুর্যও রপ্ত তার।

কমল গাঙ্গুলি সামনে ঝুঁকল একটু। গলার স্বরও খাটো।—তাহলে তার বদলে তোমার কাছ থেকে যদি কিছু চাই?

মীনা অপলক চেয়ে আছে তেমনি। ভিতরটা খুশিতে খলখল করে উঠছে তার। এই চাওয়ার পিছনে স্থূল কামনা-বাসনা কিছু নেই এ সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। তার থেকে ঢের গভীর কিছু আছে। ঢের জটিল কিছু। এই লোকেরও মুশ্‌কিল আসান চাই। টাকার বিনিময়ে এ রকম মুশ্‌কিল আসানের কাজ সে আরো করেছে। সে দুঃসময়ে একদা ইন্‌সিওরেন্সের দালাল প্রমথ কাকা খদ্দের জুটিয়ে দিয়েছে। তাকে টোপ হতে হয়েছে। জীবন্ত টোপ। লোভনীয় টোপ। কাজের শেষে প্রমথ কাকা তার বখরা বুঝে নিয়েছে। এখন অবশ্য প্রমথ কাকাকে ছেঁটে দিয়েছে সে। কিন্তু ওয়েলফেয়ার অফিসার হয়ে বসার পরেও খুব সংগোপনে টোপের কাজ মীনা আরো দুই একটা করেছে। যত ওপরতলার মানুষ তত তাদের জটিলতা। মীনার ব্যাঙ্কের পাশ বইয়ে এর মধ্যে মাইনের জমা টাকা বাদ দিয়ে এই খাতের বাড়তি টাকাও কম জমল না।

আবারও তাকে টোপ হতে হবে, হয়তো আগের থেকে ঢের ঢের বড় টোপ। বলল, আমার দেবার কি আছে! তবে অনায়াসে জীবনটা দিতে পারি।

খুশি হল।—না অতটার দরকার হবে না। তোমার জীবনের অনেক দাম।...তোমাকে একটা কাজ করে দিতে হবে... এ ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট অ্যাসাইনমেন্ট। অ্যাণ্ড ভেরি সিক্রেট ট্যু।

মীনার ডাগর দু'চোখ সরলতায় মোড়া।—আমাকে দিয়ে হবে বলছেন?

মুখের দিকে চেয়ে অল্প অল্প হাসছিল কমল গাঙ্গুলি। মাথাও নাড়ল।—শুধু তোমাকে দিয়েই হতে পারে। কিন্তু এখন নয়, শীগগিরই বলব।

…গতকাল নিজেই আবার সে প্রসঙ্গ তুলেছিল কমল গাঙ্গুলি বলেছে, দিন কতকের জন্যে তোমাকে বাইরে যেতে হচ্ছে একটু।

মীনা এতটুকু ঘাবড়াবার মেয়ে নয়। সপ্রতিভ মুখে প্রায় দুর্বোধ্য কিছু শুনল যেন।—বাইরে বলতে?

বাইরে বলতে এই গরমে কোন ঠাণ্ডা জায়গায় ছাড়া আর কি।

মীনা হেসে ফেলল।—বেড়াতে যাচ্ছি?

নিশ্চয়। দেড় বছর ধরে আছ, একটা দিনের ছুটি নিলে না। হাসিমাখা তির্যক দৃষ্টিটা একবার তার মুখের ওপর বুলিয়ে নিয়েছে কমল গাঙ্গুলি—ইউ ডিজার্ভ এভরিথিং ফর এ গুড রেস্ট। সামনের উইক থেকে তিন সপ্তাহের ছুটি চেয়ে আজই একটা দরখাস্ত করে দাও। পরের কথা পরে হবে।

পরে নয়, মীনার কেমন ধারণা, কথা আজই হবে। এই জন্মদিনে। সেটাই হয়তো সব থেকে দামী উপহার হবে এবারে।

ড্রেসিং টেবিলের সামনে থেকে উঠল মীনা। একেবারে চানের জন্যে প্রস্তুত হয়ে ভিতরের দরজা খুলে বাথরুমের দিকে চলে গেল। গলির বাড়িতে এ রকম নিজস্ব বাথরুমের ব্যবস্থা আর কোন বাসিন্দার নেই। খুবই ছোট অবশ্য। তবু এটুকুও পরিপাটি করে সাজানো। বাড়িঅলাকে কিছু টাকা খাইয়ে তবে এই ব্যবস্থা করতে পেরেছে। তা নাহলে পঙ্গু বাবাকে নিয়ে অন্যত্র উঠে যেতে হত। উপার্জন যা করে এখন, অনায়াসেই এর থেকে ঢের ভালো দু'ঘরের একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করে থাকতে পারে। কিন্তু মীনার সে রকম ইচ্ছে আদৌ নেই। কারণ, জীবনের কোন্ অধ্যায়টা সে নিশ্চিন্তে কাটাবে তা এখনো জানে না। কোথা থেকে কোথায় ভেসে যেতে হবে একদিন তারও স্থিরতা কিছু নেই। তাই পাকাপাকি ভাবে হাতের মুঠোয় যেটুকু তার ওপর নির্ভর করাই ভালো। বাবা এখানে তার জীবনটা

কাটিয়ে দিতে পারবে। যেটুকু পুঁজি তার হয়েছে তার জোরে বাবার ব্যাপারে অন্তত নিশ্চিন্ত। ও যে চুলোতেই যাক, বাবাকে কেউ এখান থেকে নড়তে সরতে বলবে না।

চান-টান সেরে ঘরে এলো আবার। গলির বাড়ির অন্য সব ঘরেও সাড়া জেগেছে ততক্ষণে। গলির মধ্যে গজ তিরিশেক ঢুকে গেলে একটাই একতলা দালান। সারি সারি খুপরি ঘর কতগুলো। মাঝে চার ইঞ্চির দেয়াল। ঘরের দরজা-জানালা খুলে জোরে কথা বললে এদিক থেকে ওদিকে শোনা যায়। মীনার পরনে একটা লাল-পেড়ে সাদা জমিনের পাতলা শাড়ি। গায়ে ফিকে গোলাপী রঙের ব্লাউস। পিঠের ওপর ভিজে ছড়ানো চুল। দু' চার মিনিটের মধ্যে মাথায় চিরুণি বুলিয়ে নিল একটু। শুকনো তোয়ালে দিয়ে মুখটা ভালো করে মুছে নিয়ে হাল্‌কা করে পাউডার বোলালো। তারপর আয়নার ভিতর দিয়েই নিজের দিকে থমকে তাকালো একটু। ড্রয়ার থেকে কৌটো বার করে ছোট করে সিঁদুরের টিপ পরল একটা। তারপর নিজের দিকে চেয়েই হাসমাখা ভ্রূকুটি করে উঠল।

.. কপালে লাল টিপ পরলে আপত্তি নেই, কিন্তু সিঁদুরের টিপ পরতে দেখলে মাসিমা রেগে যেত খুব। বলত, ও সব যখন পরার তখন তো কপাল গড়ের মাঠ করে বিবিটি সেজে ঘুরে বেড়াবি—সব-কিছুই খেলার জিনিস তোদের!

বাবার ঘরে এলো। মুখে একটা বিরক্তির ছায়া পড়ো-পড়ো হয়েও পড়ল না। বাবা দু'পা ছড়িয়ে বিছানায় বসে আছে। লুঙ্গিটা উরুর ওপর পর্যন্ত তোলা। বিল্টু দলাই-মলাই করছে। সকালে বেশ কিছুক্ষণ এ-পর্বের পর তবে অঙ্গে সাড় ফেরে তার। বাবার সমস্ত কাজেই বিল্টু মোটামুটি এক্সপার্ট এখন। মীনাদের একটা পুরনো ঝিয়ের ছেলে বিল্টু। এগারো বছর বয়সে ওর মা ওকে এখানে কাজে লাগিয়ে দিয়েছিল। এখন সতেরো বছরের আধা-জেয়ান ছেলে ও। দিদিমণি ওর হাত ধরে বা গায়ে হাত বুলিয়ে কিছু বললে গলে জল হয়ে যায়। মীনা এখন ওকে ভালো মাইনে দেয়, মোটামুটি ভালো

ট্রাউজার আর চকচকে জামা কেনার টাকা দেয়। আর মুখে প্রায়ই বলে, তোর সব ভার আমার, কিন্তু আমার বাবার সব ভার তোর ওপর।

বিল্টু মনের আনন্দেই বাবার সব ভার বহন করে। ছায়ার মতো তার সঙ্গে লেগে থাকে। এ-ঘরের মেঝেতেই শোয়। রান্না-বান্নাও মোটামুটি শিখে নিয়েছে। তার রান্না দিদিমণিকে খাওয়াবার তেমন সুযোগ মেলে না বলে মনে মনে খেদ। পাড়ার ছোকরারা ওকে ঠাট্টা করে বলে, সীতার ছিল ভক্ত হনুমান, এই কলিযুগে তুই হলি গিয়ে তোর দিদিমণির ভক্ত বাঁদর।

মীনার মুখে বিরক্তির ছায়া পড়ো-পড়ো হয়েছিল কারণ বাবার হাতে বিড়ি। আর সমস্ত ঘরটায় তার বিচ্ছিরি চাপা গন্ধ। এ গন্ধটা মীনা একেবারেই সহ্য করতে পারে না। কতদিন ভালো ভালো সিগারেট আনিয়ে দিয়েছে বাবাকে। কিন্তু বিড়ি পেলে বাবার সিগারেট রোচে না।

মেয়েকে দেখেই বিড়ির জ্বলন্ত টুকরোটা তাড়াতাড়ি সামনের ভাঙা পেয়ালায় ফেলে দিলেন বিজন দত্ত। ঘরে অ্যাশপট আছে, কিন্তু বিড়ির মতো সেটার থেকে ওই ভাঙা পেয়ালাই পছন্দ। বিল্টুকে তাড়া দিলেন, নে, এগুলো সরা এখান থেকে—আর জানলা-টানলাগুলো খুলে দে।

মেয়ের বিড়ির গন্ধ সয় না এ প্রভু আর তার অনুচর দুজনেই জানে। ও ঘরে ঢুকতে পারে জানলে বিল্টু আগে থাকতে সচেতন করে দেয়, বিড়ি সরান, দিদিমণি আসবে এক্ষুণি।

বাবার এ-রকম ব্যস্ততা দেখলে মীনার হাসি পায় আবার দুঃখও হয়। বাবা ওকে ভালো কতটা বাসে আঁচ করতে পারে না। বাসে নিশ্চয়। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে, বাবার সমীহ ভাবটা যেন তত বাড়ছে। আসলে ভিতরে ভিতরে ভয় বাবার। কখন না জানি মেয়ে তাকে ছেড়ে চলে যায়। ভাবে হয়তো, চলে গেলে এই পঙ্গু জীবন আঁকড়ে থাকার মতো কোন সম্বলই আর থাকবে না।

আজকের দিনে বুকের তলায় এই প্রথম নরম অনুভূতি একটা। প্রমথ কাকার কাছে শুনেছে, এই বাবাই একদিন জোরালো অফিসার ছিল ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানির। আর তেমনি তিরিক্ষি মেজাজের মানুষ ছিল।....বিপাকে পড়লে মানুষ কত নুয়ে পড়ে।

এগিয়ে এসে তার পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করল মীনা।

ভদ্রলোক হতচকিত প্রথম একটু। তারপর কি মনে হতেই খুশিতে আটখানা।—কি ব্যাপার! তোর জন্মদিন নাকি আজ?

বাবার পাশে বসে পড়ে হেসে মাথা নাড়ল মীনা। বাবার পাশে বসা প্রায় হয়ই না আজকাল।

কি কাণ্ড! আমাকে আগে বলিসনি কেন? আমি তো ভুলেই গেছলাম।

আদুরে গলায় মীনা জিজ্ঞাসা করল, আগে বললে তুমি কি করতে বাবা?

আমি! আর কি করতাম বল্, আগে থাকতে অনেকক্ষণ ধরে আনন্দ পেতাম। আমার আর কি আছে বল্…।

পল্‌কা রাগ দেখায় মীনা।—কেন, আমি নেই?

ওদিক থেকে বিল্টু এগিয়ে এসে ওর পায়ে প্রণাম ঠুকল একটা। মীনা আবারও হাসি মুখে ভ্রূকুটি করল একটু। এ ছোঁড়াটা প্রণামও করে, আবার দূর থেকে সুযোগমত চুরি করে আপাদমস্তকে চোখ চালিয়ে কিছু যেন রহস্য খোঁজে। মীনা অনুমান করতে পারে, ওকে নিয়ে গলির ছোঁড়া-ছুঁড়িদের যে জটলা হয় তার অনেকটাই বিল্টুর কানে আসে।

বলল, প্রণাম করে টাকা আদায়ের ফন্দি। আচ্ছা যা, তোর দুটো টাকা পাওনা হল, নিয়ে যা, আর কথা শুনে যা—

উঠে দাঁড়াল। আর তারপরেই মনে হল বাবা চেয়েই আছে তার দিকে। চোখে পলক পড়ছে না। চোখাচোখি হতে বিজন দত্ত বলে উঠলেন, বাঃ, খাসা দেখাচ্ছে এখন তোকে, যাচ্ছিস কোথায়, আর একটু বোস না।

মীনা বসল আবার। বুকের তলায় কেন যেন মোচড় পড়ল একটু। বাবা কি দেখছে ওর দিকে চেয়ে? কেন হঠাৎ সুন্দর দেখছে? কোনদিন তো এ রকম বলে না। মনে হল, বাবার চোখে যেন দূরের তন্ময়তা।....মা কি চান করে উঠে এমনি করে ভিজে চুল পিঠে ছড়িয়ে দিত?....লাল-পেড়ে শাড়ি পরত আর লাল সিঁদুরের টিপ। বুকের ভিতরটা কেমন ধড়ফড় করে উঠল মীনার। মাসি বলত মায়ের আদলের মুখ ওর! আর প্রমথ কাকা বলত, মায়ের মতো মুখ, কিন্তু মায়ের মতো অত সুন্দর নয় তা বলে।

সঙ্গে সঙ্গে ভিতরটা তিক্ত খরখরে হয়ে উঠল তার। মরুক মরুক! সুন্দর মুখ জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যাক। লোকে বলে পিতৃমুখী কন্যা সুখী। মায়ের আদলের মুখ নিয়ে ওর জীবনে সুখ আসবে কেমন করে? এর থেকে বাবার আদল পেয়ে ঢের কম সুন্দর হলেও বোধহয় সুখের আশা থাকত।

আজকের দিনে নিজের হাতে বাবাকে ভালো-মন্দ কিছু রেঁধে খাওয়াতে পারলে ভালো লাগত। বই পড়ে কিছু বাছাই রান্নার বিদ্যেটা রপ্ত করেছিল। আর ভালো খাওয়ার ব্যাপারে বাবার এখনো লোভ খুব। নিজের ভিতরেই বিস্ময়ের আঁচড় পড়ে একটা। যেভাবে ছাব্বিশটা বছর পার করে এই সাতাশে এসে দাঁড়াল, এই সব নরম অনুভূতিগুলো তো একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবার কথা। অথচ হঠাৎ-হঠাৎ এগুলো এসে বেশ উত্যক্ত করে।....যাক, সকাল সাড়ে ন'টার মধ্যে বেরিয়ে পড়তে হবে আজ—এ সব ভাবারও সময় নেই।

উঠে দাঁড়াল আবার। বিল্টুকে বলল, এসে টাকা নিয়ে যা। সকলের জন্য বেশ ভালো জলখাবার নিয়ে—দোকানে চায়ের কথা বলে আসিস। আর আজ বাবার জন্যে তোকে ঘরে কিছু রাঁধতে হবে না। বাবা ভালো ভালো যা খেতে চায়, সব আমাদের সেই বড় রেস্তোরাঁ থেকে গরম গরম নিয়ে আসবি। বাবাকে দিবি, নিজে খাবি। আমার ফিরতে রাত হবে, আমার জন্যে রাখার দরকার নেই।

ভালো খাবারের নামে বাবার দু'চোখ আনন্দে চকচক করছে। মীনা হেসেই তাকালো তার দিকে।

বিজন দত্ত বললেন, আজকের দিনেও একটু তাড়াতাড়ি ফেরার জো নেই তোর?

না বাবা। বেজায় চাপ কাজের। খুব শীগগিরই হয়তো বেশ কিছুদিনের জন্যে বাইরে চলে যেতে হবে আমাকে, তাই অনেক কিছুর ব্যবস্থা করার আছে।

ওর বাইরে যাবার নামেই বাবার মুখ শুকোয়। উতলা স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, কতদিনের জন্যে?

তিন-চার সপ্তাহ হতে পারে। তুমি কিছু ভেব না বাবা, আমি তোমার সব ব্যবস্থা করে যাব। তোমার আমার নামে ব্যাঙ্কের সেই পাশ বই আর চেক বইও তোমার কাছে রেখে যাব। হঠাৎ কোন কারণে হাতের টাকা ফুরোলে তুমি চেক কেটে দেবে. কিচ্ছু অসুবিধে হবে না, তুমি দেখে নিও।

টাকা আর চেক বইয়ের কথা শুনে বিজন দত্ত যেন আশ্বস্ত হলেন একটু। মানুষের এতখানি দুর্বলতা দেখলেও বুকের তলায় মোচড় পড়ে মীনার।...ব্যাঙ্কের দুটো পাশ বই আছে ওর কাছে। একটা বাবার আর তার দুজনের নামে, আর একটা নিজের নামে। দুজনের নামের পাশ বইয়ের টাকার অঙ্ক দেখেই বাবার চোখ ঠিকরোয়। বারো-তেরো হাজার টাকা ওতে আছে হয়তো। মেয়ের নিজের পাশ বইয়ের টাকার অঙ্ক দেখলে বাবার মুখখানা কেমন হত দেখার লোভ। কিন্তু দেখায়নি কখনো।

বাইরে যেতে যেতে ভাবল, দুজনের নামের ওই পাশ বই আর চেক বই বাবার হেপাজতেই রেখে দেবে এবার থেকে। আর ফেরৎ নেবে না।

বিল্টু এসে টাকা নিয়ে খুশি মুখে দোকানে ছুটল।

মীনা দত্ত আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল আবার। এবারে সুচারু প্রসাধন পর্ব। কিন্তু আয়নার সামনে এসে দাঁড়াতেই মীনার আবার

মনে হল, অন্য দিনগুলোর থেকে এই দিনটার তফাৎ হবে কিছু। অনেক কিছুরই যেন আগে থাকতে আভাস পায় সে।

....মন বলছে, অন্য দিন নয়, আজই কিছু একটা রহস্যের যবনিকা উঠবে। জন্মদিনের সব থেকে বড় উপহারটা আজই মিলবে। ভিতরে যা আছে সব উজাড় করে কমল গাঙ্গুলি আজ তার সামনে ডালি সাজিয়ে দেবে।

সমস্ত মুখ লাল্‌চে আর ধারালো হয়ে উঠছে মীনার।

হাতে সময় আছে। সাড়ে ন'টায় গাড়ি আসতে বলেছে, এখন সবে সাতটা। ধীরে সুস্থে শাড়ি বাছাই করার জন্যে ট্রাঙ্ক খুলে বসল। এরই মধ্যে পর পর দু'দুটো উৎপাত। একটা তো অভাবিত বলা যেতে পারে।

দরজা দুটো সবটা ভেজানো ছিল না, চার ছ' আঙুল ফাঁক ছিল। ঘরের আলো জেলে শাড়ি বাছাই করতে বসে ছিল মীনা। ও-দিক ফিরে বসা অবস্থাতেই কেমন মনে হল শব্দ না করে কেউ যেন দরজা দুটো খুলছে।

ঘাড় ফিরিয়ে অবাক। এই গলিরই ও-মাথার ঘরের বউটা দাঁড়িয়ে। যার নাম সীতা। নাম জানে বটে, বছর আষ্টেক আগে ওর বিয়েও হতে দেখেছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনদিন ওর সঙ্গে বাক্যালাপ হয়নি। না হবার বিশেষ একটু কারণও থাকতে পারে। হয়তো ওর স্বামীই ধারে কাছে ঘেঁষতে নিষেধ করে দিয়েছে।

বউটার পরনে আধময়লা চার আঙুল লাল পেড়ে শাড়ি। তার নিচে তেমনি বিবর্ণ ব্লাউজ একটা। ক'খানা হাড়ের ওপরে চামড়া বসানো। তেলের অভাবে মাথার চুল লাল আর জট পাকানো।

আট বছর আগে বলু ঘোষ ওকে যখন বিয়ে করে ঘরে এনেছিল, কালোর ওপর বেশ মিষ্টি মুখ ছিল মেয়েটার। আর স্বাস্থ্যও মোটামুটি ভালো ছিল। এরই মধ্যে এই হাল। তিনটে হাড় জিরজিরে ছেলে মেয়ে। তার মধ্যে দুটোকে কোলে-কাঁখে নিয়ে গলির মুখে মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে থাকে। না থেকে করবে কি। বদ্ধ গরম। ওদের ঘরে পাখা তো স্বপ্ন। ওর স্বামীটাকে খুব ভালোই চেনে মীনা। পাজির পাঝাড়া একেবারে। অনেক রাতে মাতাল হয়ে ফেরে। আবার অনেক রাতে বাড়িই ফেরে না। বউটাকে মারধোরও করে শুনেছে। কিন্তু তখনো চেঁচামেচি করে না বউটা, দাঁত কামড়ে থেকে পড়ে পড়ে মার খায়। বলু ঘোষ চাকরি একটা করে, কিন্তু মাইনের চার ভাগের এক ভাগও বউ ছেলেমেয়ের ভোগে আসে না। এ সব খবর বিল্টুর মুখে শোনা মীনার। এই গলির বাড়ির সকলেই সকলের ঘরের খবর রাখে। শুনতে না চাইলেও কানে আসেই।

এই অতি নিরীহ বউটাই কত সময় অকারণ বিরক্তির কারণ হয়েছে মীনার। চোদ্দ থেকে আজ সাতাশ—এই তেরো বছরে ওকে ঘিরে এই গলির বাতাসে কিছু সরব আর নীরব তরঙ্গ বয়ে যেতে দেখেছে। সেই কবে পরপুরুষের সঙ্গে ঘর ছেড়েছে মীনার মা, এ-খবর এই গলির বাড়ির অন্তত একটি প্রাণীরও জানার কথা নয়। কারণ, সেই অঘটনের কম করে এগারো বছর পরে এই বাড়িতে ওদের পদার্পণ। কিন্তু দেখা গেছে ওরা আসার দু'মাসের মধ্যে সে খবর এখানকার সকলেই জেনে গেছে। হয়তো বা প্রমথ কাকারই নেশার ঝোঁকে মুখ ঢিলে হয়েছিল কখনো। কারণ চেনা-জানা লোক মারফৎ এখানে মাথা গোঁজার ঠাঁই সে-ই করে দিয়েছিল। তখন তার গেলাসের এক মাতব্বর বন্ধু এখানে থাকত। সে-ই ব্যবস্থা করে দিয়েছিল।

কিন্তু এই মেয়ে অর্থাৎ মীনাও ঘরে থাকবে কিনা—তখন থেকে এও এক উপাদেয় জটলার বিষয় হয়ে উঠেছিল। বয়স্কা রমণীরা তাদের দামাল ছেলেদের সামাল দেবার কথা ভেবেছে। অনেকে

আবার ওকে ডেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ওর মায়ের কথা জানতে চেয়েছে। মা কবে গেল, কোথায় গেল, কার সঙ্গে গেল। জিজ্ঞাসায় ভাঁটা পড়েছে, কিন্তু কৌতূহল থিতিয়েই আছে এখনো। ফার্স্ট ডিভিশনে হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করা আর তারপর শর্টহ্যাণ্ড আর টাইপরাইটিং শিখতে যাওয়াটাও সরল চোখে দেখেনি এখানকার বাসিন্দারা। চেহারা-পত্র ভালো, তাই রুই-কাতলা শিকারের ধান্দা ভেবে নিয়েছে। তারপর সে সবও পাশ-টাশ করে হুট্ করে প্রথম বারের সেই ভালো চাকরি পেয়ে গেছল যখন, তখনও এখানকার বেশির ভাগ মেয়ে পুরুষের চোখে একটা গোপন বেসাতির সংশয় উঁকিঝুঁকি দিত সর্বদা। তলার ব্যাপার কিছু না থাকলে এই দিনে ভালো চাকরি জোটানো এত সহজ!

...দেড় বছরের মধ্যে এক চরম দুর্যোগের ফলে সেই চাকরি খুইয়ে ভিতরের এক অব্যক্ত হিংস্র তাড়নায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়েছিল সে। জটিল পথে পা ফেলেছিল। সে-পথের সহায় প্রমথ কাকা। সে-সময় তার কাজের প্রোগ্রাম কোন ছকে বাঁধা ছিল না। প্রায়ই বিকেলে বেরুতে হত, বেশি রাতে ফিরত, কোন রাতে হয়তো ফিরতই না। বাবা শুনেছে, কোন্ বড় হোটেলে রিসেপসনিস্টের কাজ নিয়েছে মেয়ে। মাইনে বেশি। ডিউটি বেশি হলে ওভারটাইম মেলে। বাবা কোনদিন বাধা দেয়নি। তার কেবল ভালো করে বাঁচার তাড়না। আর কিছু তলিয়ে দেখার বা ভাবার মন গেছে।

...তখনো কৌতূহল উদগ্র হয়ে উঠতে দেখেছে এই গলির বাড়ির মেয়ে-পুরুষদের। সংশয়ে আর লোভে জোয়ান লোকগুলোর চোখ চকচক করেছে। মেয়েদের চোখে অবিশ্বাস আর কৌতূহলের স্তূপ জমেছে।

....আজও খুব সরল পথে পা ফেলে চলেছে ভাবে না মীনা দত্ত। কাজের পট বদল হয়েছে, পরিস্থিতি বদল হয়েছে। তবু না। আজ ওর বড় চাকরি সম্পর্কে হয়তো সন্দিগ্ধ নয় গলির কেউ। বড় প্রতিষ্ঠানের ঝকঝকে গাড়ি এসে ওকে নিয়ে যায়, দিয়ে যায়, গলি

থেকে বেরুতে দেখলেই তক্‌মা পরা ড্রাইভার সেলাম ঠুকে গাড়ির দরজা খুলে দেয়। ড্রাইভারের জামার বুকে প্রতিষ্ঠানের জ্বলজ্বলে ব্যাজ আঁটা। মীনার চাকরি সম্পর্কে এর আগেই হয়তো বা ভিতরে ভিতরে যাচাইও হয়ে গেছে। এখন আর চাকরিতে অবিশ্বাস না করুক, এ-রকম চাকরি জোটানোর পিছনে রহস্য কিছু নেই এ তারা ভাববে কি করে? ওকে দেখলে এখনো ছেলে-বুড়ো মেয়ে-পুরুষ প্রায় সকলের চোখেই সেই কৌতূহল সেই জিজ্ঞাসা। বাবা-মেয়ে তেরো বছর আগে এসে কোন রকমে একটা ঘরে ঠাঁই নিয়েছিল। মাসের সতেরো টাকা ভাড়া গুণতে হিমসিম খেতে হত। এখন ওরাই একমাত্র দু'ঘরের বাসিন্দা এখানে। একটা ঘর খালি হতে বাড়িঅলাকে মোটা সেলামী দিয়ে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন সেই দু'ঘরে পাখা, ট্রানজিস্টার, ড্রেসিং টেবিল, খাট। সঙ্গে নিজের টাকায় তৈরি আলাদা বাথরুম। এত সব সত্ত্বেও এই মেয়ে তার বাপের সঙ্গে এই গলির বাড়িতেই থেকে যাবে—এ কেউ বিশ্বাস করে না। সকলেই ভাবে, এখান থেকে সরে গেল বলে। অথচ এ-যাবত এ-মেয়ের যা কিছু সব রহস্যই থেকে গেল। তাই এখনো আসতে যেতে অনেকের জোড়া-জোড়া চোখ মীনার গায়ে-পিঠে বিঁধে থাকে।

যারা চেয়ে চেয়ে কেবল দেখেই ওকে তাদের মধ্যে বলু ঘোষের বউ এই সীতা একজন। গলির বয়স্করা সীতা বলে ডাকে ওকে। কিন্তু সীতা বউয়ের দেখাটা ঠিক যেন আর পাঁচজনের মতো নয়। তার ফ্যাকাশে মুখটা ওর দিকে শুধু নিবিষ্ট হয় না, মরা চোখে যেন কৌতুক উঁকিঝুঁকি দেয়। আর তখনই ভিতরে ভিতরে সব থেকে বিরক্ত হয় মীনা দত্ত।

....কারণ আছে। ওইভাবে তাকিয়ে বউটা যেন তাকে বুঝিয়ে দিতে চায়, সে তার কিছু দুর্বলতার খবর রাখে।

...ওর স্বামী বলু ঘোষের যাকে বলে প্রথম প্রণয়িনী মীনা দত্ত। মীনা পনেরো ছাড়িয়ে সবে ষোলোয় পা দিয়েছে তখন। আর ওই বিটকেলের একুশ বাইশ হবে। গলির ছোকরাদের মধ্যে সে-ই

মাতব্বর তখন। পনেরো বছর বয়েস পর্যন্ত ফ্রক পরে কেটেছে মীনার। তারপর মাসির ধমক খেয়ে ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরেছে। যতদিন ফ্রক পরত ততদিন পর্যন্ত বলু ঘোষ কিছুটা অবজ্ঞার ভাব দেখালেও ফাঁক পেলেই পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বোলাতো শুধু কিন্তু শাড়ি ধরার সঙ্গে সঙ্গেই যেন মাথা ঘুরে গেল বলু ঘোষের।

স্কুলে যাবার সময় গলি ছাড়িয়ে মোড়ের ওধারে দাঁড়িয়ে থাকত। তারপর সঙ্গ নিত। ছুটির সময় স্কুল গেটের বিশ তিরিশ গজ দূরে এসে দাঁড়াত। তারপর সামনের মোড় পর্যন্ত একসঙ্গে এসে তফাত হত। ক্লাসের মেয়েরা হাসত হি-হি করে। আর বল্টু ঘোষের সমবয়সী ছেলেরা মজা পেত।

মীনা দু'চক্ষে দেখতে পারত না পাজীটাকে। কিন্তু ভয় করত খুব। মারামারিতে বেশ হাত পাকিয়েছে বলু এরই মধ্যে বোমাবাজীতে নাম করেছে। প্রথম আলাপেই ওকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে, তাকে হেলাফেলা করলে ফল ভালো হবে না। মীনাকে ভালো লেগেছে বলেই এগিয়ে এসেছে—নইলে কত মেয়ে দেখা আছে তার। ভালো লাগার নিদর্শন স্বরূপ এক একদিন রেস্তোরাঁয় টেনে নিয়ে গিয়ে চপ কাটলেট খাইয়েছে। আর কিছু দিন না যেতে ঘোষণা করেছে, মীনাকেই বিয়ে করবে ঠিক করে ফেলেছে সে। শিগগিরই কোন্ এক কারখানায় চাকরি পাওয়ার কথা, পেলে পরেই বিয়েটা করে ফেলবে। আর বলেছে, বিয়ের পর বউকে সুখেই রাখবে সে।

মীনা মুখে কিছু বলতে পারে না। ডাকলে কাছে যেতে হয় কিন্তু বুকের তলায় কাঁপুনি তার। ভেবে রেখেছে, সে-রকম বেগতিক দেখলে মাসির কাছে গিয়েই হত্যা দেবে আবার।

পাজীটার লোভ বাড়তেই থাকল। ফাঁক পেলে গায়ে হাত দেয়। দুজনের জন্যে ম্যাটিনি শোয়ে সিনেমার টিকিট কাটে। মীনার সিনেমা দেখার লোভ ছিল খুব এটা অস্বীকার করতে পারবে না। মন না চাইলেও সিনেমার নাম শুনলে না গিয়ে পারত না। অন্ধকার

ঘরে ও পাজীর অসভ্যতা বাড়ত তখন। সিনেমা থেকে ফেরার পর প্রত্যেক বারই ওর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় চিন্তা করত মীনা।

একদিন এমন কাণ্ড করে বসল শয়তানটা যে মনে মনে মাসির কাছে চলে যাওয়া একরকম স্থিরই করে ফেলল মীনা। দুপুরের নিরিবিলিতে ওকে নিয়ে একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকেছে বলু ঘোষ। বয়কে মাংস আর মোগলাই পরোটার অর্ডার দিয়ে কেবিনের পর্দা টেনে দিল। অর্ডার শুনে খুশি মনে বসতে যাচ্ছিল মীনা, তার আগেই ও শয়তান খপ করে দু'হাতে ওর মাথাটা ধরে সেই দিনে-দুপুরে চোখের পলকে ঠোঁটের ওপর একটা চুমু খেয়ে বসল। তারপর নিজের চেয়ারে বসে শব্দ না করে হাসতে লাগল।

সেই থেকে দুশ্চিন্তায় মাথা খারাপ হবার দাখিল মীনার। মাসির বাড়ি চলে যাবে ভাবলেই যাওয়া সহজ নয়। তাছাড়া স্কুলের কি হবে?

উপায় একটা যেন আকাশ ফুঁড়ে এগিয়ে এলো। হাতে ছোট একটা স্যুটকেস, আর সতরঞ্চিতে জড়ানো বালিশ বগলে মামাতো ভাই নিখিল বিশ্বাস এই গলির বাড়িতে এসে হাজির একদিন। কোনরকম ভণিতা না করে বাবাকে জানালো, কিছুকাল এখানেই থাকতে হবে তাকে এখন। তার খাওয়া খরচ বাবদ পঁচাত্তর টাকা করে দেবে—দু'বেলা খাবে, তার বেশি নয়। আর একখানা মাত্র ঘর যখন, রাত্রিতে ঘরের বাইরের ছোট পাকা বারান্দায় অনায়াসে থাকতে পারবে সে।

মীনা প্রথমে ভেবেছিল, মাসে পঁচাত্তর টাকা পাওয়ার লোভে বাবা রাজি হয়েছিল। দিন কতক যেতেই মনে হয়েছে, তা নয় বাবা অনেকটা যেন ভয়ে রাজি হয়েছে। কারা সব আসে নিখিলদার কাছে, এখানে একটা কথাও হয় না। চুপচাপ নিখিলদা তখন ওদের সঙ্গে বাইরে চলে যায়। যেটুকু বোঝার পাঁচ সাত দিনের মধ্যেই মীনা বুঝে নিয়েছে। কলেজের দস্তুরমত ভালো ছাত্র নিখিলদা, দেশে

তার বাবার অবস্থা রীতিমত ভালো, নাম-করা হস্টেলে রেখে ছেলেকে পড়াত। সেই ছেলে হস্টেল ছেড়ে এখানে কেন? তার কলেজের বই-পত্রই বা সব কোথায়?

বুঝল সবই। এদিকে বলু ঘোষের বেচালও চোখে পড়তে দেরি হল না নিখিলদার। ভুরু কুঁচকে একদিন সরাসরি ওকে জিজ্ঞাসা করল, গলির ওই বাঞ্চে ছেলেটার সঙ্গে তোর কি ব্যাপার রে?

সঙ্গে সঙ্গে গলগল করে মনের কথা আর মনের ত্রাস ব্যক্ত করে ফেলল মীনা। নিখিলদা বলল, ঠিক আছে, আমি ব্যবস্থা করছি।

বয়সে ও শয়তান কম করে তিন বছরের বড় নিখিলদার থেকে। কি ব্যবস্থা হতে পারে মীনা ভেবে পায়নি। কিন্তু তিন দিন না যেতে একেবারে ছাইবর্ণ মুখ বলু ঘোষের। তার ওপর দিয়ে যেন ঝড় বয়ে গেছে একটা। তিন দিন বাদে এক দুপুরে নিখিলদার সামনেই ওর কাছে এসে মাথা গোঁজ করে বিড়বিড় করে বলল, আমাকে এই শেষবারের মতো ক্ষমা কর। বলেই হনহন করে চলে গেল।

শুনে মীনা হাঁ একেবারে। বিশ্বাস করবে কি করবে না ভেবে পায়নি। তাই দেখে নিখিলদা হেসে ফেলেছিল। বলেছিল, ওরা কত কাপুরুষ তুই জানিস না, তুই নিজে রুখে দাঁড়ালেও সরে পড়ত—বুঝলি গাধা মেয়ে?

...পরের দু'বছরের মধ্যেই কারখানায় চাকরি পেয়ে সীতাকে ঘরে এনেছে বলু ঘোষ। মীনা মনে মনে মুখ বেঁকিয়েছে, সীতা নাম যখন, জ্বলে পুড়ে মরবে না তো কি—নইলে গুণধর রামচন্দ্রের ঘরে আসে!

সে যা-ই হোক, যে মীনা দত্তকে নিয়ে এতদিন ধরে গলির বাড়িতে এত কৌতূহল এত জটলা, তার সঙ্গে একদিন সম্পর্কটা কেমন ছিল সে-কি আর বলু ঘোষ তার বউয়ের কাছে জাহির করতে বাকি রেখেছে? মীনার ধারণা, সেই কারণেই তার বউটা ফ্যাকাশে মুখে অমন করে তাকায় ওর দিকে, আর তার নিষ্প্রভ চোখেও কৌতুক ঝরে।

দরজা ফাঁক করে এই সীতা বউকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মীনা বিরক্ত যেমন অবাকও তেমনি। কয়েক পলক চেয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করল, কি ?

একটু ভিতরে আসব ?

মীনা সামান্য মাথা নাড়ল। অর্থাৎ আসতে পারে। গম্ভীর আচরণেও কমনীয় মাধুর্যটুকু ব্যাহত হতে দেয় না মীনা।

সীতা বউ ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল। তার মুগ্ধ দু'চোখ ঘরের চারদিকে চক্কর খেল একদফা। যা শুনেছে তার থেকেও যেন বেশি সুন্দর দেখছে সব কিছু। তারপর কাছে এসে তিন হাত ফারাকে মেঝের ওপরেই বসে পড়ল।—আজ তোমার জন্মদিন শুনলাম। কি সুন্দর দেখাচ্ছে ভাই তোমাকে !

এ রকম অন্তরঙ্গতা ভালো লাগার কথা নয়, লাগলও না। মীনার সব থেকে বেশি দখল নিজের সত্তার ওপর। মুখে কোন রকম বিরক্তির আঁচড় পড়তে দিল না। তাছাড়া গলির বউয়ের কতটুকুই বা শিক্ষা দীক্ষা। কিন্তু এত কাছ থেকে বউটাকে দেখে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। চাউনিটা অদ্ভুত ঘোলাটে, নীল নীল শিরা হাতের চামড়া ফুটে উঁচিয়ে আছে, আর মুখের চামড়া যেন হাড়গুলোকে চেপে ধরে আছে। মুখটাও রক্তশূন্য হলদেটে। জিজ্ঞাসা করল, জন্মদিনের খবর তোমাকে কে বলল ?

তোমার বলু। ছেলেটা আর মেয়েটার হাতে দুটো গরম সিঙ্গাড়া দিয়ে বলল, আজ আমার দিদিমণির জন্মদিন—খা তোরা। অস্বস্তিকর ঘোলাটে চোখ দুটো মীনার মুখ থেকে সরছে না।—তোমার সাতাশ হল শুনলাম, তোমার থেকে এক বছরের ছোট আমি—আমাকে ছেচল্লিশ বললেও কেউ অবিশ্বাস করবে না।

হলদেটে দাঁত বার করে হাসতে চেষ্টা করল। মীনা ট্রাঙ্কের শাড়ি নাড়াচাড়া করতে লাগল। ব্যস্ত বোঝাতে চায়।....পুরনো দিনের সেই সব কথা বউকে বলে বাহাদুরী নিতে ছাড়েনি নিশ্চয়। চেষ্টা করেও বিরক্তি চাপা সহজ হচ্ছে না মীনার।

অনেক দিনের আলাপী মেয়ের মতো সীতা বউ এবার হেসে হেসে বলল, তিনদিন আগে টাকার খোঁজে আমার সোয়ামী কালামুখোর ভাঙা বাক্স ঘাঁটতে গিয়ে হঠাৎ একটা মজার জিনিস পেয়ে গেলাম, তারপর থেকেই তোমার কাছে একবারটি আসব আসব করছিলাম দিদি—আজ জন্মদিন শুনে এসেই গেলাম।

এবারে মীনা আস্তে আস্তে ঘুরে বসল তার দিকে। কিছু একটা উদ্দেশ্য নিয়েই বউটা এসেছে তার কাছে।

আঁচলের আড়াল থেকে হাত বার করল সীতা বউ। হাতে তেলচিটে খাম একটা। অনেক দিনের পুরনো। ওটারও চারদিক লালচে হয়ে উঠেছে। ফটোটা নিজে একবার দেখল। হলদে দাঁত বার করে আরো বেশি হাসছে। তারপর তেমনি হাসতে হাসতেই সেটা মীনার দিকে ধরল। বলল, দেখে আমি হেসে বাঁচি না, বাঁদরেরও আবার গজমতির শখ ছিল।

সেই ছবির দিকে তাকিয়েই মাথায় আর মুখে এক ঝলক রক্ত উঠে এলো মীনার।....হ্যাঁ, বলু ঘোষের পাল্লায় পড়ে সেই সময় সস্তার একটা স্টুডিওতে ফটোও তোলা হয়েছিল বটে একবার। আর ঠিক ঠিক সময় বুঝে বলু ঘোষ একটা হাতও ওর কাঁধের ওপর তুলে দিয়েছিল বটে। তার দু-চারদিন বাদেই নিখিলদার ধাতানি খেয়ে পাজীটা ঠাণ্ডা হয়েছিল। ফটো তোলার ব্যাপারটা তখন ভুলেই গেছল মীনা।....সেই ফটো। সেই ছবি।

মীনার ইচ্ছে হল ছোঁ মেরে ফটোটা কেড়ে নেয়। কিন্তু কম করে তিন হাত তফাতে বসে আছে সীতা বউ। একটুও না নড়ে স্থির অপলক চোখে তার দিকে চেয়ে রইল মীনা।

ফটোটা ধীরে সুস্থে আবার খামে পুরতে পুরতে সীতা বউ বলল, ভাবলাম এটা তোমাকে দিয়ে আসি, ও শয়তানকে বিশ্বাস নেই, ছেলেবয়সের কাণ্ড-মাণ্ড নিয়ে কখন আবার—

কথার মাঝে থেমে গিয়ে মীনার স্থির কঠিন মুখের দিকে তাকাল। নিজের মুখের হাসি গেছে। সাদাসিধে ভাবেই বলল, গোটা চল্লিশ

টাকা আমার বড় দরকার দিদি, ছেলেমেয়েগুলোর মুখে কিছু দিতে পারতাম, তাছাড়া বাঁচার রাস্তাও একটা মাথায় এসেছে, এই ক'টা টাকার জন্যেই আটকে গেছে।

চেয়েই আছে মীনা। এভাবে আসার অর্থ স্পষ্ট এখন। অনুচ্চ কঠিন গলায় বলল, তুমি তাহলে ব্ল্যাকমেল করতে এসেছে আমাকে?

ঠিক বুঝল না। জিজ্ঞাসা করল, কি মেল?

ছবি দেখিয়ে টাকা আদায় করতে এসেছ?

এই নাও ছবি। একটু ঝুঁকে খামটা তার কোলের ওপর ফেলে দিল সীতা বউ।—এই ছবি ওই শয়তানের কাছে থাকা উচিত নয় বলেই দিতে এসেছি!....এই চল্লিশটা টাকা আমি তোমার কাছে ভিক্ষে চাইছি দিদি, এ ক'টা টাকা তোমার হাতের ধুলো, আর আমার কাছে বেঁচে যাওয়ার ব্যাপার।

আরো একটু চেয়ে রইল মীনা, ছবি হাতে এসে গেছে। এবারে বউটাকে গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দেবে? উঠল। খাটের ওপর থেকে হাতব্যাগটা নিয়ে চারখানা দশ টাকার নোট বার করে সীতা বউয়ের হাতে দিল।—নাও। আর কোনদিন এসো না।

টাকা পেয়েই উঠে দাঁড়াল বউটা। বলল, না, আর কোনদিন আসব না। চলে গেল।

বাবার ঘরে বাবার সঙ্গে বসেই চা জলখাবারের পর্ব শেষ হল। প্রসাধনের পাট শেষ করেই ঘর থেকে বেরিয়েছিল। এবারে নিজের ঘরে এসে জামা কাপড় বদলে প্রস্তুত হয়ে নিল। হাতঘড়ি দেখল। সময় আছে এখনো। বন্ধ দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে বিরক্তির একশেষ। প্রমথ কাকা দাঁড়িয়ে দরজায় ধাক্কা মারতে যাচ্ছিল। ওকে দেখেই বলে উঠল, বা বা! তোকে যে খাসা দেখাচ্ছে রে আজ—তা এই জন্মদিনে আমি বাদ! অ্যাঁ?

কথার ফাঁকে ঘরের ভিতরে সেঁধল। বেঁটেখাটো মানুষ, তামাটে গোল মুখ, বাঁ কান বরাবর সিঁথি, লম্বা চুল উল্টোদিকের কান পর্যন্ত পাট করে আঁচড়ানো। বছর পঞ্চাশ হবে বয়েস, বাবার থেকে অনেক ছোট। পকেটে পয়সা থাকুক না থাকুক বেশবাসে চাকচিক্য আছে। কোঁচানো ধুতির ওপর সিল্কের পাঞ্জাবি—তার নীচে সামারকুল জালি গেঞ্জি। পায়ে চকচকে শুঁড় তোলা নাগরা জুতো। সমস্ত মুখ আর সিল্কের জামা ঘামে জবজব করছে। সোজা খাটে গিয়ে ধুপ করে বসে পড়ল প্রমথ কাকা।

পাখাটা বাড়িয়ে দে। দেড় মাইল পথ হেঁটে এলাম। এসেই শুনি তোর জন্মদিন, আর আমি ব্যাটা বেঁচে আছি কি নেই তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামানোর দরকারও মনে করে না। দরকার পড়লে তখন প্রমথ কাকার খোঁজ। গলায় মেকি অভিমানের সুর।

এই একজনকে যেন মীনার একেবারে ভিতর থেকে ছেঁটে দেবার তাগিদ এখন। দরকার পড়লে অর্থাৎ বিপাকে পড়লে প্রমথ কাকাকে খুঁজে বেড়াতে হয়নি। সে নিজে থেকেই এগিয়ে এসেছে। সেই আসার সঙ্গে নিজের স্থূল স্বার্থের ষোল আনা যোগ। ও রকম দরকারের দিন গেছে বলেই হয়তো ভিতরে ভিতরে ক্ষোভ তার।

মীনা জবাব দিল, বাজে বোকো না, আমার জন্মদিনটা এমন একটা কি ভাল দিন যে সব নেমন্তন্ন করে ডেকে আনতে হবে! এসে গেছ যখন বিল্টুকে গিয়ে বল—বাবার সঙ্গে বসে খেয়ে যাও।

সে আর তোকে বলতে হবে না। হৃষ্ট বদন প্রমথ কাকার।—তা তোর জন্মদিনটা ভালই ছিল বলতে হবে, আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে। আনন্দের চোটে তোর বাবা আমাকে একটা বিলিতি সেই জিনিস প্রেজেন্ট করে ফেলল। হঠাৎ আবার যেন কি মনে পড়ে গেল প্রমথ কাকার, আরো বেশি হাসতে লাগল।—খারাপ ছিল বটে হাসপাতাল থেকে তোকে নিয়ে তোর মা যেদিন ঘরে ফিরল। সকালে এসে বিকেলের মধ্যেই আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলে। ....দাদার আশ্রয়ে তোদের বাড়িতেই তো থাকতুম আমি।

বিরক্তি ভুলে হঠাৎ কেন যেন আরো শুনতে ইচ্ছে করছে মীনার। জিজ্ঞাসা করল, কেন, তুমি কি করেছিলে?

আমি? আমি আবার কি করব। ক'টা দিন ঠাকরোন বাড়ি ছিলেন না, সেই ফাঁকে একটু বেশি ফুর্তি-টুর্তি করেছিলাম। সে খবর কেউ কানে তুলে দিয়েছিল নিশ্চয়—

যেতে বলল আর তুমি চলে গেলে?

হুঁঃ, সেই যেতে বলা মানে গনগনে আগুনের ছ্যাঁকা, কে তিষ্ঠোবে। দেখিস তো নি···

অর্থাৎ তেজ ছিল খুব। কিন্তু সেই তেজের সঙ্গে পরের কতটুকু মেলে ভ্রূ কুঁচকে মীনা তার দিকে চেয়ে রইল একটু। সকাল থেকে আজ অনেকবার ওই মায়ের কথা মনে হয়েছে। প্রত্যেক জন্মদিনেই কম বেশি মনে হয়।

সত্যি করে বল তো, তিনি আছেন কি গেছেন?

প্রমথ কাকা এবারে যথার্থই অবাক একটু—কার কথা বলছিস, তোর মা?

মা শব্দটা মুখে উচ্চারণের রুচি নেই। মাথা নাড়ল। চাউনিটা জিজ্ঞাসু। প্রমথ কাকা জবাব দিল, সেই কবেই তো গেছে, তের চোদ্দ বছর হয়ে গেল।

মীনা হঠাৎ রেগেই গেল।—চালাকি কোরো না, ঠিক ঠিক বল।

এর আবার ঠিক-বেঠিক কি! তোর বাবার বাক্স ঘেঁটে দেখগে যা, বেনারস মিউনিসিপ্যালিটির ডেথ সার্টিফিকেট পেয়ে যেতে পারিস—ওটা ডাকে এসে গেল বলেই তো তোর মায়ের নামের পেড-আপ ইন্‌সিওরেন্সের টাকাটা তোর বাবা হাতে পেল। কি দশা তখন তার, দু'বেলা খাওয়া জোটে না—টাকাটা পেয়ে তখনকার মত বেঁচে গেল।

রাগে ক্ষোভে মীনা চুপ খানিক। এক রমণী যেন তার প্রাপ্য দণ্ড ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে। জিজ্ঞাসা করল, মায়ের নামে ইন্‌সিওরেন্স ছিল?

চোখ বড় বড় করে ফেলল প্রমথ কাকা—সে কি অল্প-স্বল্প, তোর মায়ের নামে পঞ্চাশ হাজার টাকার ইন্‌সিওরেন্স করিয়েছিল তোর বাবা। হবে না কেন, তোর মা তো তখন স্কুলে চাকরি করছে।

মীনার কাছে এও একটা খবর।—মা রীতিমত লেখাপড়া জানা মেয়ে ছিল তাহলে?

পাতানো ভাইঝিকে অবাক হতে দেখে প্রমথ বোস মজা পাচ্ছে। —সে কি রে! মায়ের সম্পর্কে কোন খবরই রাখিস না! বাংলা অনার্সে বি-এ পাশ ছিল তোর মা—সে সময় চাট্টিখানি কথা নয়।···চাকরি করলেও ইন্‌সিওরেন্সের প্রিমিয়াম তোর মা এক পয়সাও দেয়নি—এক বছরের তেইশ চব্বিশ শো টাকা প্রিমিয়াম তোর বাবাই কোন রকমে যোগাড় করে দিয়েছিল।···তারপর তোর মা হুট্ করে হাওয়া হয়ে যেতে সেই পলিসি পেড-আপ করে দেওয়া ছাড়া আর উপায় কি? তোর মায়ের ডেথ সার্টিফিকেট পেতে তবে সেই দু'হাজার তিনশো না চারশো টাকা হাতে এলো।

না, এ সব খবরই নতুন মীনার কাছে। মাসিও মুখ ফুটে কোন দিন কিছু বলেনি। বলবে কেন, তাহলে যে বাবার উদারতার কথাও বলতে হয়।

পুরনো দিনের গল্প শেষ। প্রমথ বোস খাট ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। —দাদার কাছে যাই···গোটা পঞ্চাশেক টাকা দে দেখি, পকেট একেবারে গড়ের মাঠ—

এই উদ্দেশ্যেই এসেছে মনে হতে মীনা ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠল, টাকা কোথায় পাব—টাকা নেই।

হাসি লেগেই আছে প্রমথ বোসের মুখে।—দিয়ে দে, আজকের দিনে মুখ ফুটে চাইলাম যখন দিয়েই ফেল—তুই হলি গিয়ে আপনার জন, আবার কোথায় কার কাছে হাত পাততে যাব।

খানিক আগে চল্লিশ টাকা খসেছে। মীনার মনে হল, এও আর এক ধরনের ব্ল্যাকমেল। একবার দু'বার নয়, এ-যাবত অনেকবারই টাকা দিয়েছে। দশ পনেরো বিশ থেকে থাঁই এখন পঞ্চাশ টাকায়

উঠেছে। আজ যে মাটিতে দাঁড়িয়ে সে, এই লোকের সাহায্য আর কোন দিন দরকার হবে না। তবু লোকটার অসাধ্য কর্ম কিছু নেই। টাকা চাইলে কিছু অন্তত দিতে হয়। এটুকু দুর্বলতা ছেঁটে ফেলতে পারে না বলে নিজের ওপরেই রাগ হয় মীনার।

হাত ব্যাগ খুলে গুণে গুণে তিনখানা দশ টাকার নোট বার করল।—এই নাও, আর আমার কাছে নেই। ফের টাকা চাইলে বাবাকে বলে দেব! কাউকে টাকা দেবার নামেই বাবার মেজাজ তিরিক্ষি হয়, তাই এ-ভাবে সমঝে দেওয়া।

প্রমথ কাকার মুখে বিগলিত হাসি।—দাদা বলে ডাকি, তাকে আবার দুঃখ দিতে যাবি কেন।...ঠিক আছে, হাতে বেশি না থাকলে কোত্থেকে আর দিবি! টাকাটা সিল্কের পাঞ্জাবির ভিতরের পকেটে রাখতে রাখতে দরজার দিকে এগলো। ঘুরে দাঁড়াল আবার।—যে কথা বলব বলে এলাম তাই তো ভুলে গেলাম রে! মুখে আবার সেই জ্বালা ধরানো হাসি।—কাল সন্ধ্যেয় গ্র্যাণ্ডের সামনে তোর সেই প্রথম বস্ চঞ্চল রায়-চৌধুরীর সঙ্গে দেখা। গাড়ি থেকে নেমে বউয়ের পিঠ জড়িয়ে ধরে ভিতরে ঢুকতে যাচ্ছিল, আমাকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিল—চিনতেই চাইল না।...বড় ঘরে বিয়ে করেছে শুনেছিলাম, বউটাও বেশ পরী পরী দেখতে—বুঝলি।...তারপর থেকেই ভাবছিলাম খবরটা তোকে দেব—কিছু যদি প্ল্যান-ট্যান মাথায় আসে তোর, এক হাত দেখে নেওয়া যেতে পারে। ভেবে দেখিস—

প্রমথ কাকা চলে গেল। মীনার দু'কানের পর্দায় দুটো পেরেক বিঁধিয়ে দিয়ে গেল যেন। সমস্ত মুখ হিংস্র, লাল। পিঠের সাদা দাগের ওপরে ঠিক এই দিনেই আবার যেন ছোবল পড়ল একটা।

নিজের অগোচরে খাটের ওপর বসল।....কোন প্ল্যান মাথায় আসে কিনা ভেবে দেখতে বলে প্রমথ কাকা কি ইঙ্গিত করে গেল সেটা ওর অন্তত বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়।...বড় ঘরে বিয়ে করেছে। বউ পরী-পরী দেখতে। বউয়ের কোমর জড়িয়ে ধরে

গ্র্যাণ্ডে যায় আনন্দ করতে।…একজনের এই সাধ আহ্লাদ আনন্দ একেবারে ঘুচিয়ে দেবার মতো কোন অস্ত্র হাতে নেবে কিনা মীনা, প্রমথ কাকা সেই প্রস্তাবই করে গেল।

…বছর দেড় দুই আগে হলেও হিংস্র আক্রোশে লাফিয়ে উঠত মীনা। নিজের ভালো-মন্দ বিবেচনা করত না। ওই একজনের শেষ দেখতে পেলে আর কিছু চাইত না। এখনো চায় না। কিন্তু অবস্থার রকমফের হয়েছে এখন একটু। মস্ত এক প্রতিষ্ঠানের ওয়েলফেয়ার অফিসার সে। বহুজনে চেনে-জানে। ওই একজনের জীবন সেভাবে বিষাক্ত করে তুলতে চাইলে নিজের নামটা জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা। নিজেকে সম্পূর্ণ আড়ালে রেখে চট্ করে কিছু করার কথা ভাবা যাচ্ছে না। তবু ভেবে দেখতে হবে:

…কমল গাঙ্গুলির মাথায়ও প্ল্যান আছে কিছু। সে যে দরের মানুষ, মনে হয় সেটা সহজ সরল কিছু হবে না। মন বলছে, ওই ভদ্রলোকও নিজের মুখোশ খুলবে আজ। সেও তাকে টোপ বানাতে চায়, অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। তাই যদি হয়, খুব ভালো, আরো ভালো। অমন একজন জোরদার মানুষ সহায় থাকলে কি না করতে পারে মীনা? মুখোশ খসে গেলে আর সমস্যার সমাধান হলে ওই কমল গাঙ্গুলির সাহায্যেই হয়তো এই একজনের শেষ দেখা সহজ হবে অনেক।

তিন

পনেরো ষোলো বছর বয়েস থেকেই ঘরের স্বপ্ন দেখত মীনা। মায়ের ঘর ছাড়া আর ঘর ভাঙার ক্ষত তার বুকের তলায় ছিলই।

তাই সার্থক সুন্দর পরিপূর্ণ এক ঘরের স্বপ্নে সে বিভোর হয়ে থাকত সব সময়।

বারো তেরো বছর বয়সে মাসি যখন ফিরে আবার বাবার হেপাজতে ঠেলে দিল, তখনো এক প্রস্থ বড় রকমের নাড়াচাড়া খেয়েছিল সে। এই গলির ঘরে নয়, বাবা তখনো তিন-ঘরের একটা ভদ্র ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকত। সেই বাড়িতে তার মা থাকত। সেই বাড়ি থেকেই তার মা উধাও হয়েছিল। মাসির কাছ থেকে মীনা ফিরে আসার আগে আর পরেও প্রমথ কাকা থাকত বাবার সঙ্গে।

তখন থেকেই নিদারুণ দৈন্য দশা দেখে এসেছে সে। দৈন্য দশার সঙ্গে যুঝেছে। বাবা ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানির চাকরিটি খুইয়ে বসেছে জানত না। প্রমথ কাকা বলত, মা ঘর ছাড়ার পর থেকেই বাবার আর কাজে কর্মে মন ছিল না। কোম্পানি আর কত কাল বরদাস্ত করবে। দিয়েছে ছাড়িয়ে। বাবার নিজেরও লাইফ ইন্‌সিওরেন্স ছিল কিছু। ধারে ধারে সেটা ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। গ্র্যাচুইটি আর প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের কিছু টাকা হাতে পেয়েছিল। কলসীর জল মেপে খেলেই বা ক'দিন আর। তাও ফুরিয়েছে। সেই হাঁড়ির হালের সময় ওকে মাসি বাবার কাছে ঠেলে দিয়েছে।

না দিলে হয়তো উপোস করেই মরতে হত বাবাকে। সে আসার ফলে মাসে আড়াইশো টাকা করে সাহায্যও এসেছে মাসির কাছ থেকে। সেটুকুই তখন একমাত্র সম্বল। কত কালের বাড়ি ভাড়া পড়েছিল জানে না। বাড়িওয়ালা ক্রমাগত বাড়ি ছাড়ার নোটিস দিচ্ছে আর কেসের হুমকি দিচ্ছে। দরজার কাছে কাবলিওয়ালা বসে থাকে। তখনো সন্ধ্যের পর বাবাকে মদ খেয়ে ঝিম মেরে বসে থাকতে দেখা যেত মাঝে মাঝে।

মীনা দূর থেকে দেখত তাকে। কাছে যেতে ভয় করত। তাকালে রক্তচক্ষু। তখন থেকেই জেনেছে বাবার এ-ভাবে দেউলে হয়ে যাবার মূলে শুধু একজন। তার মা। মা ওর বাবার ঘর ভেঙেছে। ঘরের এই হাল করেছে।

অতএব তার ঘর চাই। এমন ঘর চাই যেখানে কোন অভাবের চিহ্নমাত্র নেই। এমন ঘর চাই যেখানে কেবল সুখ, কেবল আনন্দ।

আজ প্রমথ কাকার মুখ থেকে শুনে বোঝা যাচ্ছে, কেমন করে হুট করে কিছু টাকা হাতে পেয়ে ওকে নিয়ে বাবা চুপিসাড়ে সেই ফ্ল্যাট বাড়ি ছেড়ে এই গলির বাসায় এসে উঠতে পেরেছিল, মায়ের পেড-আপ ইন্‌সিওরেন্সের টাকাই হবে নিশ্চয়। এক বছরের সেই প্রিমিয়ামের টাকাও নাকি বাবাই গুণে দিয়েছিল। সেই একটা বছরের মধ্যেই যদি মা মরত মীনা খুশি হত। তাহলে বাইশ তেইশশো ছেড়ে থোকে পঞ্চাশ হাজার টাকাই তক্ষুণি বাবার হাতে আসত।

এই গলির ঘরে উঠে আসার পর থেকে মীনা তার স্বপ্নের ঘর মনে মনে আরো বড় করে তুলেছিল। এই দিন থাকবে না, এই অবস্থা থাকবে না। একটা একটা করে বছর পার হয়েছে। পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো—মীনার আয়নার সামনে বিভোর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বেড়েই চলেছে। তখন এই ঘরও নেই, বড় আয়না ফিট করা ড্রেসিং টেবিলও নেই। বাবার ঘরের দেয়ালে টাঙানো এক হাত প্রমাণ আয়নার সামনেই দাঁড়িয়ে থাকত। এক আধ সময় বাবার চোখেও পড়ত সেটা। বিরক্ত হয়ে বাবা বলত, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে কি দেখিস অত—অঁ্যা?

মীনা তখন জিভ কামড়ে ছুটে পালাত।... কি দেখত মীনা একেবারে ঠিক ঠিক জানে না। কিন্তু যত দেখত তত তার মনে হত, এই দিন থাকবে না, এই অবস্থা থাকবে না। থাকতে পারে না।

...ষোলো বছর বয়সে ঠিক এই কারণেই বলু ঘোষকে দু'চক্ষে দেখতে পারত না। সে ওকে সিনেমা দেখাক, রেস্তোরাঁয় খাওয়াক—ও সব ভালোই লাগে। তা বলে ওকে বিয়ে করার সাধ! মাথায় বজ্রাঘাত না মীনার? ওর ঘর! ওই রকম ঘর!

বলু ঘোষ শায়েস্তা হবার পর হাড়ে বাতাস লেগেছে। কিন্তু তারপরেও ক'বছর ধরে গলির ঘরের এই মেয়ে নিজেকে কম যাচাই

করেছে? সে-যাচাই মানে পুরুষের চোখের আয়নায় নিজেকে দেখা যায়। নানা ঝঞ্ঝাটে পড়ে হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করে বেরুতেই বয়েস আঠারো পেরিয়ে গেছিল। মাথা খাটিয়ে শর্টহ্যাণ্ড টাইপরাইটিংয়ে ভর্তি হয়েছিল তারপর। সে-সব মোটামুটি রপ্ত হতে আরও একটা বছর কাবার।

মাসি তখন হুড়মুড় করে ওর একটা বিয়ে দিয়ে ফেলার জন্যে ব্যস্ত। তার সাফ কথা, চাকরি-বাকরি করতে হয় পরে করবি, আগে বিয়ে-থা হোক, যে হতভাগা জায়গায় থাকিস কখন কি বিভ্রাট হয়ে বসে ঠিক আছে।

কেন মাসির এই দুশ্চিন্তা, মীনা সেটা ভালো করেই জানে বোঝে। পুরুষ ছেড়ে মেয়েরাও কি ঠারে-ঠোরে কম দেখে তখন। একবার তো কাণ্ডই হল একটা। শর্টহ্যাণ্ড আর টাইপ শেখা প্রায় শেষ তখন। সকালের দিকে সেই স্কুলে যাবার সময় প্রায়ই এক সাত্ত্বিক গোছের বিধবা মহিলার সঙ্গে দেখা হত। কমণ্ডলু হাতে গঙ্গাস্নানে যায়। সামনাসামনি পড়ে গেলে মহিলা ওকে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে পথ চলে। একদিন দাঁড়িয়েই গেল। জিজ্ঞাসা করল, কি নাম তোমার গো মা?

নাম বলতে মহিলা আবার জিজ্ঞাসা করল, পদবী কি?

না—দত্ত।

দত্ত শুনে মুখখানা একেবারে বেজার করে চলে গেল মহিলা। বামুনের মেয়ে হলে নিজের ছেলে-টেলের জন্যে হয়তো ছোঁ মেরেই ঘরে তুলে নিয়ে যেত তাকে। তারপর যতদিন দেখা হয়েছে, মহিলা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে ফেলতে পাশ কাটিয়েছে।

স্বপ্নের ঘর আর সুখের ঘর কেন বড় থেকে আরো বড হবে না মীনার? এর মধ্যে মাসি কিনা হুট করে ওর একটা বিয়ে দিয়ে ফেলার জন্যে ব্যস্ত। মীনার সাফ জবাব—আগে চাকরি, পরে বিয়ে। বিয়ের এখনো ঢের দেরি।

অর্থাৎ ভালো রকম বিচার বিবেচনার সুযোগ মেলার আগে সে এর

মধ্যে মাথা গলাচ্ছে না। চাকরি পাওয়ার আগে সে-রকম বিচার বিবেচনার সুযোগ কোথায়?

সে-রকম চাকরিও যেন হাতের মুঠোয় একেবারে অনায়াসে এসে গেল। মাসির বাড়িতে মেসো নামে যে মানুষটির বাস, এই বিশ বছরে তাঁর সঙ্গে ক'টা কথা হয়েছে মীনা বলতে পারবে না। সেই মেসো হঠাৎ একদিন ডেকে পাঠালেন ওকে। জিজ্ঞাসা করলেন, শর্টহ্যাণ্ড টাইপরাইটিং শেখা হয়েছে?

মীনা মাথা নাড়ল। হয়েছে।

কত স্পীড?

একশো কুড়ি আর পঁয়ত্রিশ।

চাকরি করবি?

কলেজের মাস্টার মেসোমশায়ের চাকরি দেবার মতো জোরটা কোথায় মীনা ভেবে পেল না। মাথা নাড়ল। অর্থাৎ পেলেই করবে।

কথা না বাড়িয়ে মেসো ছোট চিঠি লিখলেন। চিঠি খামে বন্ধ করে তার ওপর নাম ঠিকানা লিখে ওর হাতে দিলেন। বললেন, আমার বন্ধু। মঙ্গলবার বা শুক্রবার যে-কোন একদিন এই ঠিকানায় তাঁর সঙ্গে দেখা করবি। আমার সঙ্গে কথা হয়ে আছে।

খামের ওপর লেখা—সমর গাঙ্গুলি, সি. এ.। তারপর ডালহৌসি স্কোয়ারে এক কেবল্ ম্যানুফ্যাকচারিং ফার্মের ঠিকানা। সি. এ. বলতে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। তার সঙ্গে কেবল্ ম্যানুফ্যাকচারিং ফার্ম-এর কি সম্পর্ক মীনা ভেবে পেল না।

নির্দিষ্ট দিনে সেই ফার্মের ঠিকানায় এসে উপস্থিত হবার পর বুকের তলায় ধুকপুকুনি তার। একটা বিশাল প্রাসাদের সমস্ত পাঁচতলা জুড়ে সেই কেবল্ ম্যানুফ্যাকচারিং ফার্মের আপিস। লিফ্‌ট সকলের জন্যে কিনা ভেবে না পেয়ে সিঁড়ি ভেঙে পাঁচতলায় ওঠার পর অল্প অল্প হাঁপাচ্ছিল।

মাঝের বিশাল হলে একসঙ্গে কম করে দুশো আড়াইশো লোক

কাজে ব্যস্ত। হলের দেয়াল ঘেঁষে সারি সারি ঘর। খুব সম্ভব অফিসারদের ঘর সেগুলো। মীনা বোকার মতো দাঁড়িয়ে চারদিক দেখতে লাগল। পরিবেশ দেখেই ঘাবড়েছে। ওর মতো একটা অনভিজ্ঞ মেয়ের এখানে চাকরি হবে ভাবতে পারছে না।

একটা তরতাজা সুশ্রী মেয়ে ও-রকম দাঁড়িয়ে থাকলে কারো না কারো চোখে পড়বেই। যেদিকে দাঁড়িয়ে আছে সেদিকের অনেকেরই চোখে পড়েছে। সদয় হয়ে তাদের একজন উঠে এসে জিজ্ঞাসা করল, কাকে খুঁজছেন ?

মীনা ভয়ে ভয়ে হাতের খামটা তাকে দেখাল।

নাম পড়ে লোকটা বলল, আজ মঙ্গলবার, অডিটার সাহেবের আসার কথা বটে, এখনো আসেননি। আপনি বসুন এখানে।

তার নির্দেশে একজন বেয়ারা সেই চত্বরের মধ্যেই একটা চেয়ার এগিয়ে দিল। মীনা বসে বাঁচল। তারপর বসে আছে তো বসেই আছে।

খানিক বাদে দেখা গেল, দেয়ালের দিকের একটা ঘরের দরজা খুলে একটা লোক বেরুল। ভারী সুশ্রী চেহারা। পা থেকে গলা পর্যন্ত দামী সাহেবী পোশাক। বয়েস সাতাশ আটাশের মধ্যে। তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে বেয়ারাগুলোর শশব্যস্ত হাব-ভাব লক্ষ্য করল মীনা। কর্মরত মানুষগুলোও ঘাড় বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে দেখছে কোন্ দিকে যায়।

হলটার চারদিকও আবার শৌখিন কাঠের রেলিং দিয়ে ঘেরা। এই রেলিংয়ের বিন্যাসেই এত বড় হলটাকে ছোট বড় অনেকগুলো ভাগে ভাগ করে ফেলা হয়েছে। আবার ভেতর দিয়ে এ-মাথা ও-মাথা করাও যায়।

....লোকটা যেন কাজ দেখতে বেরিয়েছে। এক-একটা চত্বরের বড় টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াতেই সেই পদস্থ মানুষটিকে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে সকলে অভিবাদন জানাচ্ছে। হাসি-হাসি মুখে কেতাদুরস্ত মানুষটি সামান্য মাথা নাড়ছে। দু-চার কথা বলে আবার

একটা বড় টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে। কাউকে কিছু বলছে, কারো বা পিঠ চাপড়ে দিয়ে আবার এগুচ্ছে। ওই একজনকে ঘিরে একটা ত্রস্ত সম্ভ্রম ভাব চারদিক থেকে যেন আছড়ে পড়ছে।

মীনা হাঁ করে সেই দৃশ্য দেখছে।

আর সেই লোক কিনা এগোতে এগোতে একেবারে তার সামনে এসে হাজির। প্রথমে মনে হল পাশ কাটিয়ে এদিক দিয়ে বেরিয়েই যাবে। কিন্তু না, দাঁড়িয়েই গেল। তারপর জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

অগত্যা অন্যদের মতো চেয়ার ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল মীনাও। তারপর ঘেমে ওঠার দাখিল। পিছনে আর চারদিকে এতগুলো মানুষ, ভ্রূক্ষেপ নেই—দিব্বি পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিল একবার। সেই রকমই হাসিছোঁয়া মিষ্টি মুখ।

হুম ডু ইউ ওয়াণ্ট প্লীজ ?

ভয়ে ভয়ে মীনা আবার হাতের খামটা বাড়িয়ে দিল তার দিকে।

মস্ত সাহেবই হবে এখানকার একজন—ঝুঁকে খামের ওপরের নামটা পড়ল। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়াল—মিস্টার গাঙ্গুলি এক্ষুণি এসে পড়বেন, হি ইজ ডিউ অ্যাট্ টুয়েল্‌ভ—সীট ডাউন প্লীজ।

চলে গেল। ওদিক দিয়ে বেরিয়ে দরজা ঠেলে আবার নিজের ঘরে চলে গেল। মীনা আস্তে আস্তে চেয়ারে বসল আবার। ক'টা মুহূর্ত জানে না, কত বড় সাহেব জানে না—মীনা একজোড়া পুরুষের চোখ দেখে উঠল। মনে হল কর্মব্যস্ত পরিবেশের মধ্যে দাঁড়িয়েও কয়েক লহমার মধ্যে লোকটা যেন একটা তৃপ্তির ছোঁয়া রেখে গেল।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে আর একজন বয়স্ক লোককে লম্বা লম্বা পা ফেলে ওই সারি সারি ঘরের আর একটাতে ঢুকে যেতে দেখল। তাকে দেখেও শশব্যস্ত বেয়ারারা ত্রস্ত সেলাম ঠুকেছে।

যে লোকটি ওকে বসতে দিয়েছিল সে এসে জানালো, ওই অডিটার সাহেব এলেন, আপনি যান।

এক সাহেবকে দেখেই মীনার বুকের তলায় কাঁপুনি। মরিয়া হয়েই এগোল।

দরজার সামনে তক্‌মা পরা বেয়ারা বসে। খামটা হাতে নিয়ে সে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল, আর সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসে দরজা ঠেলে ধরে রেখে বলল, যাইয়ে মেমসাব—

ভিতরে ঢুকল। বিশাল টেবিলের ওধারে রিভলভিং চেয়ারে বসে যে মানুষটি মেসোমশায়ের চিঠি পড়ছেন, তাঁর বয়েস খুব কম হলেও পঞ্চাশ ছাড়িয়েছে। কালোর ওপর সৌম্য চেহারা। এক-মাথা কাঁচা-পাকা ঝাঁকড়া চুল। টানা-টানা ভাবালু চোখ।

চিঠি পাশে সরিয়ে রাখলেন। মীনা দু'হাত জুড়ে কপালে ঠেকাল। তার জবাবে ভদ্রলোক সামান্য মাথা নাড়লেন কি নাড়লেন না। ওর দিকেই চেয়ে আছেন। ভাবালু টানা দুটো চোখ হঠাৎ যেন সজাগ একটু। কথা বলার আগে তাঁর যেন কিছু দেখে নেবার আছে। তাই দেখে নিচ্ছেন।…সাতাশ-আটাশ বছরের এক সাহেবের চাউনির তাৎপর্য বোঝে মীনা, কিন্তু এই বয়স্ক লোকটা এভাবে কি দেখছে ওর দিকে চেয়ে? এ কেমন জায়গায় এসে উপস্থিত হয়েছে সে! মেসোর বন্ধু হলে এভাবে দেখার কি আছে!

বোসো। তুমি মীনা দত্ত?

মীনা বসল মাথাও নাড়ল।

ভদ্রলোকের দু'চোখ মুখের ওপর আটকেই আছে তেমনি। বললেন, হায়ার সেকেণ্ডারি তো ভালো ভাবেই পাস করেছিলে, জেনারেল লাইনে পড়লে না কেন?

মেসো কি লিখেছেন চিঠিতে জানে না। দ্বিধা কাটিয়ে জবাব দিল, চাকরির দরকার হয়ে পড়েছিল….

পছন্দ হল না কথাগুলো। বললেন, চলে যাচ্ছিল যখন, পাশ-টাশগুলো আরো করে নিলে ভালো ভাবেই দরকারটা মেটাতে পারতে তখন।

অনেকটা অভিভাবকের সুরেই বললেন যেন কথাগুলো। এর আর কি জবাব দেবে, মীনা চেয়ে আছে চুপচাপ।

ভদ্রলোকের চাউনি আরো কোমল লাগছে, প্রসন্ন লাগছে। হাত

বাড়িয়ে টেবিলের বোতাম টিপতে প্যাঁক করে শব্দ হল একটা। দরজা ঠেলে সঙ্গে সঙ্গে বেয়ারা ঢুকল।

ছোটা সাব কামরামে হ্যায়?

জি সাব।

বেয়ারা চলে যেতে সমর গাঙ্গুলি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। ইশারায় মীনাকে দরজা দেখালেন, অর্থাৎ সঙ্গে যেতে হবে।

মস্ত এয়ার-কণ্ডিশণ্ড ঘর, দশ পা এগোলে তবে দরজা। সে-পর্যন্ত গিয়ে মীনা ঘুরে দাঁড়াল। ভদ্রলোক টেবিল ছাড়িয়ে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। আর পিছন থেকে ওর দিকেই চেয়ে আছেন। ওকেই দেখছেন।

ভিতরে ভিতরে মীনা দস্তুরমত ঘাবড়াল এবার।

সমর গাঙ্গুলি ব্যস্ত পায়ে এগিয়ে এলেন। দরজা খুলে ওকে নিয়ে বেরুলেন। তারপরেই তাঁর একখানা হাত সোজা ওর কাঁধের ওপর উঠে এলো। সামনে শ'য়ে শ'য়ে লোক কাজ করছে, আবার দেখছেও। কাঁধের ওপর বয়স্ক মানুষটার এই হাতের স্পর্শ অশোভন কিছু নয়, তবু বিব্রত লালচে মুখ মীনার। একটু আগে পিছনে দাঁড়িয়ে ওভাবে দেখার ব্যাপারটা না ঘটে গেলে হয়তো এ রকম অস্বস্তি বোধ করত না।

ওকে সঙ্গে করে সেই ঘরের দরজা ঠেলে সেই সাহেবটির কাছেই নিয়ে এলেন সমর গাঙ্গুলি। তখনো কাঁধের ওপর হাত। ঘরে পা দিয়েই বললেন, রায়চৌধুরী, এই মেয়েটির কথাই তোমাকে সেদিন বলে রেখেছিলাম—মিস মীনা দত্ত। তারপর ছোট সাহেবের পরিচয় দিলেন, মিস্টার চঞ্চল রায়চৌধুরী, ওয়ান অফ আওয়ার ডাইরেক্টর্স অ্যাণ্ড সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ম্যানেজার।

এবারে যতটা সম্ভব সপ্রতিভ মুখে মীনা দু'হাত জুড়ে চিবুকের কাছে তুলল। ছোট সাহেব চঞ্চল রায়চৌধুরী সামান্য মাথা নেড়ে সমর গাঙ্গুলিকে অভ্যর্থনা জানালো, বসুন—বড় সাহেবরা আপনার খোঁজ করছিলেন, দেখা হয়েছে?

মীনা পরে জেনেছে, বড় সাহেবরা বলতে এই চঞ্চল রায়চৌধুরীরই বাবা আর দাদা। নিজে না বসে মীনাকে তার সামনের একটা গদি আঁটা চেয়ারে বসিয়ে দিলেন সমর গাঙ্গুলি। বললেন, তাঁদের ব্যস্ত হতে বারণ কোরো, আমার কাজ আমি ঠিক সময়ে করে দেব। মীনার পাশের চেয়ারে একটা পা তুলে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। —একে আজই একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে দাও, স্টার্টিংটা একটু দেখে শুনে দিও—সী নিড্‌স্ মানি। আর, মিস্টার গজদারের ডিপার্টমেন্টে দিতে পারলে সব থেকে ভালো হয়, অনেক রকমের কাজ শিখতে পারবে—তারও লোক দরকার শুনেছিলাম—

এত কথার জবাবে চঞ্চল রায়চৌধুরী হেসে বলল, আমি ব্যবস্থা করছি, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—

থ্যাংক্ ইউ। চলে গেলেন।

ছোটসাহেব তার দিকে ফিরল এবার। কেমন লোক নিতে যাচ্ছে তাই যেন পরখ করে দেখল একটু। কিন্তু একটি কথাও জিজ্ঞাসা করল না। টেবিলের বোতাম টিপতে দেখা গেল ঘর সংলগ্ন পাশের একটা ছোট চেম্বারের দরজা খুলে শাড়ি-পরা একটি অবাঙালী মহিলা বেরিয়ে এলো। বছর আটত্রিশ বয়েস। কালোর ওপর মোটামুটি সুশ্রী।

সে আসতে গড়গড় করে ইংরেজিতে বলে গেল, মিসেস আয়েঙ্গার, ইনি মিস দত্ত, আমাদের আপিসে জয়েন করছেন। ফর্ম-টর্ম কি আছে ফিল আপ করিয়ে নিয়ে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার ইস্যু করে দাও। থেমে গিয়ে মীনার দিকে ফিরল, আপনার রিকোয়ারমেন্ট কত?

কি জবাব দেবে মীনা ভেবে পেল না। ফলে সমস্ত মুখ লাল হয়ে উঠল। তাই দেখে ভদ্রলোক মজা পেল যেন একটু। ঠোঁটের ফাঁকে সেই আগের মতো মিষ্টি মিষ্টি হাসি।

এর আগে আর কোথাও কাজ করেছেন? এনি এক্সিপিরিয়ান্স?

বোবার মত কাঁহাতক আর মাথা নাড়বে? সপ্রতিভ মুখে বলল, আজ্ঞে না... এ বছরই শর্টহ্যাণ্ড স্কুল থেকে পাশ করে বেরিয়েছি।

মুখের দিকে চেয়ে ছোট সাহেব ভাবল একটু। তারপর মিসেস আয়েঙ্গারের দিকে ফিরে হুকুম করল, মেক্ ইট ফোর সেভেন্টি ফাইভ —অল্ ইনক্লুসিভ। আবার ওর দিকে ফিরল।—এর বেশী এখন পারা যাচ্ছে না। কাজ করুন, পরে দেখা যাবে।

বুকের তলায় আবার দাপাদাপি শুরু হয়ে গেল মীনার। শুরুতেই চারশো পঁচাত্তর টাকা মাইনে—এ কি কানে শুনলেও বিশ্বাস করার মতো! ওকে যদি আবার জিজ্ঞাসা করা হত, খুব বেশি হলে ভয়ে ভয়ে তিনশো টাকা চাইত।

এমন অনায়াসে কারো এত ভালো চাকরি হয় মীনার ধারণা ছিল না। রাতারাতি জীবনের ছোট বৃত্ত থেকে হঠাৎ একটা বড় বৃত্তে ঝাঁপ দিল যেন। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার হাতে বাতাস সাঁতরে মাসির বাড়ি এলো। এই সমর গাঙ্গুলি মেসোর কতটা বন্ধু কি রকম বন্ধু জানার আগ্রহ এখন। কিন্তু মেসোর আবার এ সব আলোচনায় কিছুমাত্র উৎসাহ নেই। তিনি শুধু বললেন, কাজ হয়েছে যখন মন দিয়ে কাজ কর। আর মাসির সেই এক কথা, মেসোকে বলল, এবারে কাগজে একটা বিজ্ঞাপন-টিজ্ঞাপন দিয়ে ব্যবস্থা কর।

বিয়ের নামেই যে মানুষের মিষ্টি মিষ্টি মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠল মীনার, সেটা ওদের হোমরা-চোমরা ছোট সাহেবের মুখ। অত অল্প বয়সে অমন ক্ষমতাবান পুরুষ আর বুঝি সে দেখেনি। এ রকম একটা চাকরিতে বহাল হবার পর আকাশ-কুসুম স্বপ্ন দেখতেই বা আপত্তি কি! মনের কথা কে আর জানছে। বিয়ে বিয়ে করছে মাসি ও-রকম একটা ছেলে জোটাক দেখি!

এই চাকরির মূলে মেসো। কিন্তু আসলে চাকরিটা হয়েছে সমর গাঙ্গুলির জন্যে। সবই ঠিক। কিন্তু চাকরি দেবার খোদ মালিক যিনি, সেই ছোট সাহেবটির মনে না ধরলে এত সহজে এমনটা হত কি হত না এ রকম একটা রোমাঞ্চকর সংশয় মনের তলায় উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে।···প্রথমবার তার সামনে এসে দাঁড়ানো আর কয়েক লহমার সেই দেখে নেওয়ার মধ্যে পুরুষের স্তুতির ছিটেফোঁটাও ছিল না

মীনা সেটা বিশ্বাস করবে? তারপর সমর গাঙ্গুলি যখন ওকে নিয়ে তার ঘরে ঢুকলেন, হাব-ভাবে তখন অবশ্য মস্ত পদস্থ মানুষ সে। কিন্তু খুশি যে হয়েছে তা-ও কেন যেন হলপ করে বলতে পারে মীনা। এটুকু না বোঝার মতো কচি মেয়ে নয় ও।

...শুধু সে কেন, খুশি ওই বয়স্ক মানুষটাও হয়েছে। সমর গাঙ্গুলি। তাঁর হাব ভাব আচরণ কি রকম অদ্ভুত লেগেছে মীনার। মেসোর বন্ধু, এই প্রথম দেখল। কিন্তু ও যেন অনেক কাল পরের দেখা কোন স্নেহের পাত্রী তাঁর। ওঁর কথা ভাবতে গিয়ে আবার বিপরীত অস্বস্তি মীনার। গলির এই বয়সের মানুষগুলোকে দেখে দেখে ঘেন্না ধরে গেছে। ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত যা কিছু সব ওদের চোখের ভোজে লাগে যেন। সমর গাঙ্গুলিকে অবশ্য ঠিক এদের মতো মনে হয়নি, তবু একদিনের পরিচয়ে অন্তরঙ্গ স্নেহে যে ভাবে কাঁধে হাত-টাত তুলে দিলেন, কি মনে আছে কে জানে!

কাজে লাগার দু'তিন মাসের মধ্যে এক রোমাঞ্চকর আত্মপ্রত্যয়ে ভিতরটা ডগমগ মীনার। ছোট সাহেব চঞ্চল রায়চৌধুরীর সম্পর্কে অন্তত খুব একটা ভুল হয়নি তার। ষষ্ঠ অনুভূতি এরই মধ্যে প্রখর হয়ে উঠেছে আরো। হাসিখুশি ছোট সাহেবের চোখের প্রসাদ অস্পষ্ট নয় আদৌ।

লিয়াজোঁ অফিসার মিস্টার গজদারের বিভাগেই দেওয়া হয়েছে মীনাকে। প্রৌঢ় পাঞ্জাবী ভদ্রলোক, কাজ ছাড়া আর কিছু বোঝে না। সকাল ন'টায় আসে, বিকেল ছ'টার পরেও তার টেবিলে কাজের স্তূপ জমে থাকে। ফার্মের সব ক'টা শাখার সঙ্গে এই বিভাগের যোগ। এসে পর্যন্ত কত কি টাইপ করতে হয় আর কত রকমের ডিকটেশন নিতে হয়। এক একদিন হাঁপ ধরে যায় মীনার।

তবু এরই মধ্যে চোখ কান খোলা তার। কাজের ফাঁকে কোন্ লোকটা কতবার চোখ চালায় তার দিকে তাও বলে দিতে পারে। ও যেন বন্ধ ঘরের দক্ষিণের কোন জানালার মতো। দু'দণ্ড হাঁপ ফেলে বসতে হলে ওর দিকে তাকাও। ভিতরে একটু ঝিরঝিরে

মিষ্টি হাওয়ার মতো লাগবে। এত বড় আপিসে বাঙালী অবাঙালী আরো অনেক মেয়ে কাজ করছে। কিন্তু ওর মতো যে আর একটিও নেই মীনা সেটা ছ'তিন দিনের মধ্যেই বুঝে নিয়েছে।

ফার্ম সম্পর্কে মোটামুটি যেটুকু জানার জেনেছে। কেবল্ ম্যানুফ্যাকচারারদের মধ্যে বেশ নামী প্রতিষ্ঠান। উল্টোডাঙায় মস্ত কারখানা। প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি। বাইরের শেয়ার হোলডার কিছু আছে, আসল মালিক বলতে গেলে রায়চৌধুরীরাই। উনষাট ভাগ শেয়ার তাদের দখলে। বড় সাহেব বলতে চঞ্চল রায়চৌধুরীর বাবা। তিনি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এবং জেনারেল ম্যানেজার। ভদ্রলোকের ছ-ছবার হার্ট অ্যাটাকের ফলে সপ্তাহে ছ'দিন একঘণ্টা দেড় ঘণ্টার জন্যে আপিসে আসেন। মেজ সাহেব চঞ্চল রায়চৌধুরীর দাদা নবশঙ্কর রায়চৌধুরী। সে প্রোডাকশনের সর্বেসর্বা, তার আসল আপিস উল্টোডাঙার কারখানায়। এখানেও তার আপিস চেম্বার আছে, কিন্তু সপ্তাহে দুই একদিনের বেশি তার এখানে হাজিরা দেবার ফুরসত মেলে না। সমর গাঙ্গুলি কোম্পানির দীর্ঘ দিনের অডিটার। তাঁর নিয়মিত আসার দরকারই হয় না। নিজের প্রয়োজন মত আসেন যান। তবে সপ্তাহে ছ'দিন আসাটা প্রায় নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। অডিটার হিসেবে সমর গাঙ্গুলির নাম ডাক আছে—ছোট বড় এ রকম অনেক ফার্মের সঙ্গে যুক্ত তিনি। সমর গাঙ্গুলি সম্পর্কে মীনার গোড়ার দিকের অস্বস্তি বোধটা অনেক কমেছে বটে, কিন্তু এখনো ভদ্রলোকের সামনে গিয়ে পড়লে খুব যেন সহজ হতে পারে না। আপিসের সকলেই একটু শ্রদ্ধা আর সম্ভ্রমের চোখে দেখে ভদ্রলোককে। কাজের সময় এক একদিন হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়ান। ব্যস্তসমস্ত ভাবে মীনা উঠে দাঁড়াতে গেলে পিঠ চাপড়ে বসিয়ে দেন। হেসেই জিজ্ঞাসা করেন, ঠিক মত বুঝে শুনে কাজ করছ তো?

তাতেও কারো মুখে বাঁকা আঁচড় পড়তে দেখে না মীনা। অর্থাৎ, এ ভদ্রলোককে সকল রকমের সংশয়ের ঊর্ধ্বে ভাবে সকলে।

মঙ্গল আর শুক্রবারে লাঞ্চ ব্রেক-এর সময়ে নিজের ঘরে ডেকে পাঠান ওকে। ভাল টিফিন আর চা কফি খাওয়ান। মীনা তখনো খুঁটিয়ে লক্ষ্য করে। স্নেহ ভাবটাই বেশি মনে হয়। কিন্তু বন্ধুর শালীর মেয়ের প্রতি এ রকম স্নেহ দেখে অভ্যস্ত নয় বলেই খটকাও লাগে। অবশ্য হতে পারে, মেসোর মুখে ওদের দুরবস্থার খবর জানে বলেই তার প্রতি তাঁর এই স্নেহ। দরদী মানুষ তো আছেই জগতে কিছু।

ঘরে ডেকেও গাঙ্গুলি সাহেব তাকে সব সময়ে খুব মন দিয়ে কাজ করার উপদেশই দেন শুধু।

এই মানুষ প্রথম দিন যেমন এখনো তেমনি। কিন্তু স্পষ্ট পরিবর্তন যেটুকু অনুভব করছে মীনা সেটা আর একজনের। তাদের সকলের খোদ ওপরওয়ালা চঞ্চল রায়চৌধুরী। সেটুকুই রোমাঞ্চকর আমেজের মতো।

সহকর্মীদের সরস টিকা-টিপ্পনী থেকে মীনা গোড়ার ক'দিনের মধ্যেই বুঝে নিয়েছিল, ছোট সাহেব চঞ্চল রায়চৌধুরী অবিবাহিত এবং রংদার মানুষ। মিলিটারী পদস্থ মানুষদের মতো শৌখিন ছোট ব্যাটন হাতে সন্ধ্যার পর তাকে নাকি স-সঙ্গিনী বড় হোটেল রেস্তোরাঁয় দেখা যায়। আর লোকটার দিল বড়। ঠেকে পড়ে সোজা গিয়ে প্রার্থী হয়ে দাঁড়ালে দরাজ সাহায্য মেলে। তার সম্পর্কে কোন কথা উঠলে মীনা কান পেতে শোনে। ভালো লাগে। যে রকমটি হলে এই লোককে মানায়, সেই রকমই শোনে।

কিন্তু এ বিভাগে অন্তত ছোট সাহেবের আলোচনা কমে আসতে লাগল। আলোচনা হয় নিশ্চয়, হয়তো আগের থেকেও রসালো হয়। কিন্তু সেটা মীনার গোচরে নয়। কারণ স্পষ্ট। আগে ছোট সাহেব দিনের মধ্যে কতবার এই বিভাগে টহল দিতে আসত জানা নেই। এখন তিন চার বারও আসে। গজদারের আর ঘন ঘন ডাক পড়ে না তার ঘরে, বা সতেরো বার করে তার টেলিফোনের সাড়া দিতে হয় না। যে কোন দরকারে ছোট সাহেব নিজেই চলে

আসে। সেই রকমই সপ্রতিভ মিষ্টি মুখ সর্বদা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই দরকারী আলোচনা সেরে নেয়, দরকারী নির্দেশ দেয়। কিন্তু থেকে থেকে দৃষ্টিটা যে ওর দিকে ফেরে, মীনা তাও লক্ষ্য করে। কোনদিন সামনে এসে দাঁড়ায়। গাঙ্গুলি সাহেবের মতোই হেসে জিজ্ঞাসা করে, কি রকম লাগছে?

তাঁর মতো যে পিঠে হাত দেয় না, রক্ষা। ক'দিন এর মধ্যে হাসি মুখে মীনার বস্‌কেও জিজ্ঞাসা করেছে, হাউ ডু ইউ লাইক্ হার মিস্টার গজদার?

গজদার সাহেবের অত রসকস নেই। কাজে ভুল করে গোড়ায় গোড়ায় তার ধমকও খেয়েছে। কিন্তু তরুণ প্রভুর প্রশ্ন শুনে এক গাল হেসে ওর দিকে চেয়ে জবাব দিয়েছে, ও একসেলেণ্ট -- রিয়েলি গুড সার!

সহকর্মীদের মুখে চাপা হাসির তরঙ্গ দেখেও দেখে না মীনা। এদের মধ্যে একটু পদস্থ যারা, মাঝে-সাঝে ছোট সাহেবের ঘরে তাদেরও ডাক পড়ে। কিন্তু মীনার ডাক পড়লে সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। ইদানীং কাজের চাপ খুব বেড়েছে নাকি মিসেস আয়েঙ্গারের, গোছা-গোছা কি সব দরকারী চার্ট আর টেবল টাইপ করতে হচ্ছে। অতএব খুচরো কিছু কাজ গজদারকে বলে মিসেস আয়েঙ্গার নিজেই ওর কাঁধে চাপিয়ে যায়।—মিস্টার রায়চৌধুরী ওয়ান্টস্ ইউ টু গেট দিস ডান্—অফ কোর্স হোয়েন ইউ আর ফ্রী।

সেগুলো সারা হলে তাকেই আবার ছোট সাহেবের ঘরে নিয়ে যেতে হয়। ছোট সাহেব দেখে পড়ে সই করে, তারপর হেসে বলে, ফাইন। আই অ্যাম সিওর ইউ উইল ডু ওয়েল।

তারপর দিনান্তে একটা দুটো দরকারী ডিক্‌টেশন নেবার জন্যেও ডাক পড়তে লাগল। বাড়তি কাজের চাপ পড়লে আগে রিজার্ভ পুল থেকে লোক পাঠানো হত। কিন্তু ছোট সাহেব সরাসরি ওকেই ডেকে নেয় এখন। ডিক্‌টেশন নিতে হয়, টাইপ করতে হয়, আবার সেগুলো নিয়ে সই করাতে যেতে হয়।

কাজ শেষ করে দিলে ছোট সাহেব মুখের দিকে চেয়ে হাসে আর বলে, ফাইন। না, মীনা অস্বীকার করতে পারবে না। এই হাসির অর্থ ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ওর কাছে।...তড়বড় করে ডিক্‌টেশন দিতে দিতে হঠাৎ থেমে যায়, মুখ তুলে মীনা দেখে ওর দিকেই চেয়ে আছে—মিষ্টি মিষ্টি হাসছে। কথার মধ্যেও রাখা ঢাকা নেই।—আই অ্যাম সরি, বাট ইট্‌স অল্ ইওর ফল্ট্ ম্যাডাম—নাও হয়্যার ডিড আই স্টপ?

সমস্ত মুখ রাঙিয়ে ওঠে মীনার। কোন রকমে কাজ সারে। ঘর থেকে বেরুবার আগে রুমালে মুখ মুছে নেয়। মুখ এখনো লাল কিনা কে জানে—বেরুলেই তো জোড়া-জোড়া চোখ ছেঁকে ধরবে ওকে। কিন্তু বুকের তলায় দোলা লেগেই থাকে। এমন কথা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে যেন এই একজনের মুখেই মানায়। ঘুরিয়ে যা বলতে চায় তার সাদা অর্থ, দোষ তো ওরই, কারণ ও এত সুন্দর কেন?

ডিক্‌টেশন দিতে দিতে এক একদিন চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে। সামনে এসে দাঁড়ায় চেয়ার ঘেঁষে। কি লিখছে, কি রকম করে লিখছে ঝুঁকে দেখে। মীনার ভয় ধরে, মাঝের দরজা খুলে মিস আয়েঙ্গার না এসে হাজির হয়। আসবে না তাও জানে অবশ্য। কারণ তার চেম্বারে আসা যাওয়ার অন্য দরজা আছে। মনিব টেবিলের বোতাম টিপে ডাকলে তবেই এই মাঝের দরজা খোলার রীতি।

তবু ওর সেই ত্রস্ত মুখ দেখে ছোট সাহেব হেসে ফেলে। দু' চোখের নির্জলা স্তুতি গোপন করে না। চাউনিটা খানিকটা বুকের দিকে নেমেও আবার মুখের দিকে উঠে আসে। এ ব্যাপারে খাসা নির্লজ্জ যাকে বলে।

মাস পাঁচেকের মাথায় মিসেস আয়েঙ্গার ছুটি নিল এক সপ্তাহের জন্য। কিন্তু সে খবর মীনা জানে না তখনো। নিজের জায়গায় বসেই কাজ করছিল। হেলে দুলে হঠাৎ প্রমথ কাকা সেখানে এসে হাজির। ওকে দেখে আনন্দে দু'চোখ কপালে উঠল যেন।—এই

অফিসে চাকরি করিস তুই, আমাকে বলিসনি কেন? আরে এখানে তো আমার পুরনো মক্কেলের ছড়াছড়ি রে।

মিথ্যে মনে হল না। কারণ সে আসতেই পাঁচ সাতজন মাঝবয়সী সহকর্মী এসে ঘিরে দাঁড়াল। তাদের সকলের মুখেই এক কথা, এত দিন দেখা নেই কেন! আর সেই সঙ্গে বাড়তি জিজ্ঞাসা, মিস দত্ত তোমার কে হন দাদা?

আমার ভাইঝি রে বাবা, সাক্ষাৎ নিজের বড় ভাইয়ের মতো এক দাদার মেয়ে—জন্ম থেকে এ পর্যন্ত দেখে আসছি, অথচ আমাকেই বলেনি এই অফিসে চাকরি করছে! আমি কত লোকের নাড়ি-নক্ষত্র জানি এখানকার, খবর রাখিস! নে, চা-টা খাওয়া।

চা-টায়ের ফরমাশ তার পরিচিত জনেরাই দিল। এই লোকের এখানে আসাটা কেন যেন একটুও ভালো লাগল না মীনার। তাছাড়া ওর ধারণা ছিল, ইন্‌সিওরেন্সের দালালী প্রমথ কাকা এখন আর করে না। সুবিধে করতে পারে না, যতদূর জানে নানারকম ভাঁওতাবাজী করে দিন চলে তার। প্রমথ কাকার সম্পর্কে বাবাও সেই আভাস দিয়ে রেখেছিল। সে বছর দেড় দুই আগের কথা অবশ্য।… ফাঁক পেলেই তাকে এখানে আর না আসার কথা বলে দেওয়া দরকার মনে হল। কেন মনে হল জানে না। স্বার্থের যোগ থাকলে প্রমথ কাকা কারো কথায় কান দেবার মানুষ নয়। ওকে এখানে দেখে হয়তো আরো বেশিই যাতায়াত শুরু হবে তার।

ওদের টেবিল ঘিরে যারা দাঁড়িয়ে ছিল হঠাৎ তারা ছুটছাট সরে গিয়ে যে-যার চেয়ারে বসল। ঘাড় ফিরিয়ে মীনা দেখে তিন গজের মধ্যে ছোট সাহেব দাঁড়িয়ে। ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল মীনা। না, ছোট সাহেবের বিরক্তির কারণ কিছু ঘটেনি। আর একটু কাছে এসে আলতো রসিকতার সুরে জিজ্ঞাসা করল, হোয়াট্ ওয়াজ দ্য কন্‌ফারেন্স অ্যাবাউট?

তার জবাব দেওয়ার আগেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে প্রমথ কাকাও। ঝুঁকে দু'হাত জুড়ে অবনত বিনয়ে বলল, গুড মর্নিং সার।

সকৌতুকে তার দিকে ফিরল ছোট সাহেব।—গুড মর্নিং ...।

বিগলিত হেসে প্রমথ কাকা বলল, মাই নীস সার....

আপনার কী?

আমার ভাইঝি, নিজের দাদার মতো একজনের মেয়ে।

ও....কিন্তু আপনাকে তো আমি আগেও দেখেছি এখানে।

প্রমথ কাকা বলল, ইয়েস সার, এখানে অনেকের সঙ্গে আমার মাচ্ দহরম-মহরম আছে স্যার।

ইংরেজির ধাক্কায় চঞ্চল রায়চৌধুরী প্রস্থান করল। কিন্তু তার পরেও প্রমথ কাকাকে কিছু বলার অবকাশ পেল না মীনা। সঙ্গে সঙ্গে গজদার সাহেব এসে সামনে দাঁড়াল।—মিসেস আয়েঙ্গার এক সপ্তাহের ছুটি নিয়েছেন, এ উইকটা তুমি তাঁর জায়গায় কাজ করবে—মিস্টার রায়চৌধুরী ইজ ওয়েটিং ফর ইউ। তোমার যেতে দেরি হলে আমি আর কাউকে পাঠাই...।

দেরি হবে না। প্রমথ কাকার দিকে আর তাকাবারও ফুরসৎ নেই খাতা পেনসিল ব্যাগ হাতে ছোট সাহেবের ঘরের দিকে ছুটল। হঠাৎ খবরটা শুনে ঘাবড়েই গেছে।

আঙুল তুলে ছোট সাহেব পাশের চেম্বার দেখিয়ে দিল।—দ্যাট্স ইওর রুম ফর দিস উইক, অ্যাম বিজ্ই নাও, পরে ডাকছি।

যন্ত্রচালিতের মতো দরজা ঠেলে পাশের চেম্বারে চলে এলো মীনা। বুকের ভেতরটা ধড়ফড় করছে কেমন। অনেক ব্যস্ততার মধ্যেও ছোট সাহেবের গম্ভীর মুখ দেখেনি বড়। আজ বেশ গম্ভীর।

ছোটর ওপর বেশ ছিমছাম গোছানো ঘর মিসেস আয়েঙ্গারের। সুন্দর টেবিলের ওপর ছোট টাইপরাইটার। পাশে টেলিফোন। অ্যাটাচ্ড বাথ। দেয়ালের সামনে দুটো ঝকঝকে আলমারি। ওপরওয়ালার সেক্রেটারি হিসেবে এ-রকম ঘরের দখল পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। কিন্তু এয়ার কণ্ডিশণ্ড ঘরে বসেও কেন যেন ভিতরে ভিতরে ঘাম হচ্ছে মীনার।

প্যাঁক করে নিজের টেবিলে মৃদু শব্দ হল একটা। মীনা লাফিয়ে

উঠল। তারপর নিজেকে সংযত করে ভিতরের দরজা ঠেলে খাতা পেনসিল হাতে ছোট সাহেবের ঘরে ঢুকল।

গড়গড় করে একসঙ্গে তিনটে চিঠি ডিক্‌টেট করে গেল সে। ছোট সাদামাটা অফিসিয়াল চিঠি। মীনা আড়চোখে লক্ষ্য করেছে, মুখে এখনো এক ফোঁটা হাসি নেই। সেই রকমই গম্ভীর।

লাঞ্চ ব্রেকের মধ্যে আরো দু'বার ডিক্‌টেশন নেবার ডাক পড়ল। তখনও মুখভাবের রকমফের নেই।

খুব একটা কাজ না করেও ক্লান্ত লাগছে মীনার। লাঞ্চ ব্রেক-এর সময় চেয়ারে গা ছেড়ে দিয়ে বসে রইল। একটু বাদেই সচকিত। এদিকের দরজা ঠেলে মাথা বাড়াচ্ছে কে।

কে দেখা-মাত্র বিরক্তির একশেষ। প্রমথ কাকা। মীনা ঝাঁঝিয়ে উঠল, তুমি এখানে কেন?

চোখ-কান কাটা প্রমথ কাকার। ভিতরে ঢুকে হেসেই বলল, তোর অত রাগের কি হল, সাহেবকে যেতে দেখেই ঢুকেছি। ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল, বাঃ, খাসা ঘর—আজ থেকে এ-ঘর তোর?

শুধু এ-সপ্তাহের জন্যে। তুমি যাও এখন, আর এখানে বেশি এসো-টেসো না।

বা রে, আসব না কি! এখানে ক্লায়েন্ট আছে না আমার?

কিসের ক্লায়েন্ট, তুমি ইন্‌সিওরেন্সের দালালী করছ এখনো?

সবই করছি রে বাবা, কিছুই ছাড়িনি। কত রকমের ক্লায়েন্ট এখানে আছে কারো মুখ দেখে কিচ্ছুটি বুঝবি না। হঠাৎ গলা একটু খাটো করে প্রমথ কাকা বলল, যাক, শোন্, তুই এখানে কাজ করছিস তুই একজনের কাছে খবর পেয়েই দেখতে চলে এসেছিলাম। ওরা বলছিল, ছোট সাহেবের বেশ পছন্দ তোকে, দেখেও তাই মনে হয়—একটু বুঝে শুনে চলতে পারলে দিন ফিরে যাবে তোর—বুঝলি? লোকটাকে আমি আরো সাত বছর আগে থাকতে জানি—যাকে বলে দিলদার মানুষ।

এ কথাতেও কেন যেন রাগ আরো বাড়ল বই কমল না মীনার। বলল, সব বুঝেছি, তোমাকে আর বেশি বোঝাতে হবে না, তুমি এখন যাও।

প্রমথ কাকা হাসতে হাসতে চলে গেল।

আবার একা। আবার অস্বস্তি। খিদে তৃষ্ণাও টের পাচ্ছে না। টেলিফোন তুলে ক্যানটিন থেকে এক পেয়ালা চা পাঠাতে বলল শুধু। ....ছোট সাহেবের সমস্ত মুখ আজই এখন অস্বাভাবিক গম্ভীর কেন ভেবে পাচ্ছে না।

নিজের টেবিলে প্যাঁক করে আবার সেই মিষ্টি আওয়াজ প্রায় চারটের সময়। এতক্ষণের মধ্যে আর একবারও ডাক পড়েনি।

খাতা পেনসিল নিয়ে তাড়াতাড়ি দরজা ঠেলে ঢুকল। সকালের থেকেও থমথমে মুখ এখন। একবার তাকালো শুধু। চিন্তাচ্ছন্ন অপ্রসন্ন চাউনি।

টেক্ ডাউন প্লীজ, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট—আই ওয়ান্ট নো মিস্টেক!

ঘাবড়ে গিয়ে মীনা তাড়াতাড়ি খাতা পেনসিল নিয়ে প্রস্তুত হয়ে সামনের চেয়ারে বসল।

বেশ দ্রুত তালের ডিক্‌টেশন শুরু হল। কিন্তু মীনার হাত তেমনি দ্রুত এগিয়েও থেমে গেল হঠাৎ। আর তারপরেই মুখে ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠে আসতে লাগল যেন। আর একদিকে চেয়ে লোকটা গড়গড় করে যা বলে চলেছে সাদা বাংলায় তার তর্জমা,—এ যাবৎ পৃথিবীর অনেক বড় বড় কর্মীর জীবন তাদের স্টেনোগ্রাফার বা প্রাইভেট সেক্রেটারী বা পার্সোনাল সেক্রেটারীর জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠতে দেখা গেছে। শেষ পর্যন্ত পাকাপাকি ভাবে তাদের যে যার ঘরে এনে না আটকানো পর্যন্ত সেই জ্বালাযন্ত্রণার অবসান হয়নি বা বিহিত হয়নি। আজ পাঁচ মাস যাবৎ কেবল ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানির ডাইরেক্টর-কাম-সুপারভাইজিং ম্যানেজারেরও তার একটি সুন্দরী স্টেনোগ্রাফারের কারণে সেই রকম যন্ত্রণাদায়ক দশা।

তার সমস্ত কাজকর্ম পণ্ড হতে চলেছে। অতএব মহাজনদের পথ অনুসরণ করে সেই মহিলাকে পাকাপাকি ভাবে তিনি তাঁর ঘরে আটকে শাস্তি দেবার কথা ভাবছেন—

দোলা চেয়ারটা ঘুরিয়ে এবারে সোজা ওর মুখোমুখি। মিষ্টি হাসিতে সমস্ত মুখ ভরাট। গাম্ভীর্যের মুখোশ ছিঁড়ে টিঁড়ে একাকার।

মীনার সমস্ত মুখ রক্তবর্ণ। মাথা নীচু।

চঞ্চল রায়চৌধুরী বলল, আজ দু'তিন মাস ধরে এই ডিক্টেশনটা দেবার কথা ভাবছি, কিন্তু তুমি আসার পর থেকে মিসেস আয়েঙ্গারের আর একটা দিনের জন্যে শরীরও খারাপ হয় না, কোন দরকারও পড়ে না।

চেষ্টা করেও চোখ তুলে তাকাতে পারে না মীনা। হাসি মুখে লোকটা চেয়ার ছেড়ে উঠল। কাছে এলো। ঝুঁকল। মীনার এক গালে তপ্ত নিশ্বাসের স্পর্শ একটু।—ইউ লাইক্ মি····ডোণ্ট ইউ?

মীনার মাথা টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ল আরো। লোকটা কপাল আর চিবুক ধরে দু'হাতে মুখখানা নিজের দিকে তুলে ধরল, টেল মি ইয়েস অর নো—ইউ লাইক্ মি, ডোণ্ট ইউ?

মস্ত সুখের ঘর আর আনন্দের ঘরের স্বপ্ন দেখে দিন গুনছে যে মেয়ে এর পরেও চুপ করে থাকার মতো বোকা সে নয়। মাথায় আর চিবুকে হাত, তাই চোখের দিকে না তাকিয়েও উপায় নেই। দু' চোখ আর গাল বেয়ে লজ্জা চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ছে, একটু সপ্রতিভ জবাবই দিতে চেষ্টা করল তবু।—আপনি কত বড়···বলা কি সহজ।

চেয়ে আছে। দু' চোখে খুশি উছলে পড়ছে।—আমার মনের কথা তুমিও জানতে। জানতে কি না?

সামান্য মাথা নেড়ে সায় দিল মীনা। জানত। মানুষটার চোখের দিকে তাকাতে ভালো লাগছে এখন।

কবে থেকে জানতে?

প্রথম যেদিন মিস্টার গাঙ্গুলির সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম।

ইউ নটি গার্ল! তার পরেও এ ভাবে ভুগিয়েছ আমাকে!

আরো ঝুঁকল। তারপর নিজের দুই অধরে পুরুষের নিটোল গভীর উষ্ণ স্পর্শ। সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে আসছে মীনার। স্থান কাল ভুল।

ছেড়ে দিয়ে চটপট নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল।—হিয়ার ইন্ অফিস দাস ফার অ্যাণ্ড নো ফারদার। বাবাকে আমি এক্ষুণি নোটিস দিতে পারছি না, হি ইজ এ হার্ট পেশেণ্ট ইউ নো—সময় লাগবে একটু, ইন দি মিন টাইম লেট আস আণ্ডারস্ট্যাণ্ড ইচ আদার—এগ্রিড ?

মীনা মাথা নাড়ল। এখন সামনের থেকে পালাতে পারলে বাঁচে।

চঞ্চল রায়চৌধুরী আবার বলল, কাউকে এখন কিছু জানানো দরকার নেই, লেট ইট কাম অ্যাজ এ বিগ সারপ্রাইজ। এরপর আমাদের যা কিছু কথা-বার্তা সব সন্ধ্যার পর, কবে কোথায় এনগেজ-মেণ্ট আমি বলে দেব।

মিটি মিটি হাসিটুকু ছাড়া আপিসে আর কোন দিন এতটুকু বেচাল দেখেনি। কিন্তু সন্ধ্যার পর ওকে নিয়ে যে প্রমোদ রাজ্যে হানা দিতে লাগল ছোট সাহেব —সেই সব পরিবেশ সম্পর্কে মীনার কোন রকম ধারণাও ছিল না। বড় বড় চোখ ধাঁধাঁনো হোটেল রেস্তোরাঁগুলো যেন স্বর্গপুরী এক একটা। আর ওখানকার মেয়ে পুরুষেরা যেন অবিমিশ্র আনন্দের দোসর শুধু। ছিটেফোঁটা দুঃখের সঙ্গেও কারো যেন কিছুমাত্র পরিচয় নেই।

ও-সব জায়গায়ও চঞ্চল রায়চৌধুরী প্রিয়পাত্র বহুজনের। নতুন সঙ্গিনী দেখে গোড়ায় গোড়ায় তার বন্ধু-বান্ধবীদের সেই সব রসিকতা শুনে মীনার দু'কান লাল। সকলেই রায়চৌধুরীর পছন্দের উচ্ছ্বসিত তারিফ করেছে। নাচ গান হৈ হুল্লোড় আর ড্রিংক শেষ হতে হতে রাত এগারোটা বারোটা। প্রথম দিন ছাড়া মীনা অবশ্য কোন দিন অত রাত পর্যন্ত থাকেনি। বাবার দোহাই দিয়ে ন'টা সাড়ে ন'টার মধ্যে পালায়। চঞ্চল রায়চৌধুরী নিজের গাড়িতে তাকে বাড়ি পাঠিয়ে

দেয়। মীনা বাবাকে বলে, আপিসে এক্সট্রা টাইম কাজ করে। বাড়তি টাকার গন্ধ পেলেই বাবা খুশি।

একটা অদ্ভুত মোহের মধ্যে পড়ে গেল যেন মীনা। নিজের অগোচরে এমনি নির্জলা সুখ আর আনন্দের স্বপ্নই তো সে দেখেছিল। এক স্বপ্নের রাজপুত্রই বুঝি জ্যান্ত হয়ে এসেছে তার কাছে।…পা থেকে মাথা পর্যন্ত ফিটফাট ঝকঝকে দামী পোশাক, এক কালের দেড় হাত প্রমাণ শৌখিন মিলিটারী ব্যাটন। ওটার মাথায় ঝকঝকে বড় বড় ইস্পাতের পুঁতির চেন। কোন্ মিলিটারী বন্ধু নাকি ওটা তাকে সিঙ্গাপুর থেকে এনে প্রেজেন্ট করেছিল।….মুখে মিষ্টি মিষ্টি হাসি। পকেটে চেকবই। একখানা হাত মীনার কাঁধে।

আপিসে বেচাল দেখে না। কিন্তু এ-সব জায়গায় এসে ছোট-খাটো হামলা বরদাস্ত করতেই হয়। ফাঁক পেলেই বুকে টেনে নিতে চেষ্টা করে, চুমু খায়। আরো বড় হামলার বাসনাও উঁকিঝুঁকি দেয় এক একদিন। মদ একবার শুরু হয়ে গেলে অবশ্য অন্য ব্যাপার। কিন্তু তার আগে নিজেকে সামলে-সুমলে চলতে হয়। মতলব বেশি খারাপ মনে হলে মীনা মুখ ঝামটাও দেয়, এত ব্যস্ত কিসের, ফুরিয়ে যাচ্ছে সব!

চঞ্চল রায়চৌধুরী হাসে। বলে, তার মানে পাকাপাকি ঘরে না ঢোকার আগে তোমার বিশ্বাস নেই আমাকে।

বিশ্বাস আছে। কত যে বিশ্বাস কেউ কল্পনাও করতে পারবে না। দেহের কণায় কণায় বিশ্বাস বাসা বেঁধে আছে তার। তবু হাসি মুখেই বলে, পুরুষ মানুষকে বিশ্বাস কি!

কি, এত বড় কথা! বাবার হার্টের অবস্থা যে আরো খারাপের দিকে। তবু রোসো, যত তাড়াতাড়ি হয় রেজিস্ট্রির ব্যবস্থা করে ফেলতে হবে—আর পারা যাচ্ছে না।

আরো মাস চারেক বাদে বছরের এক মাস পাওনা ছুটি নিয়ে দেশে গেল মিসেস আয়েঙ্গার। মীনা দত্ত আবার তার চেম্বারে এলো। ততদিনে ওদের বাইরের মেলামেশার ব্যাপারটা আপিসসুদ্ধ,

সকলের কাছে জানাজানি হয়ে গেছে। এ সব গোপন থাকেই না শেষ পর্যন্ত। সাহস করে দুই একজন জিজ্ঞাসাও করে ফেলে, আমাদের খাওয়াটা কবে হচ্ছে মিস দত্ত?

আপিসের ছোট-খাটো অফিসারও এখন বেশ একটু সম্ভ্রমের চোখে দেখে ওকে। ব্যতিক্রম শুধু সমর গাঙ্গুলি। এবারে মিসেস আয়েঙ্গারের ঘরে এসে বসার পর এই ভদ্রলোক তাকে আর ডাকা দূরের কথা, সামনা-সামনি পড়ে গেলেও অচেনা মানুষের মতো পাশ কাটিয়ে যান, হাত তুলে নমস্কার করলেও দেখেন না।

মিস্টার গাঙ্গুলি শিগগীরই মাস ছয়েকের জন্যে বিদেশে বেড়াতে যাবেন শুনেছে মীনা। চটপট চলে গেলেই যেন স্বস্তি বোধ করে।

এদিকে চঞ্চল রায়চৌধুরীর বাবা সিনিয়র রায়চৌধুরীর হার্টের অবস্থা সত্যি আরো খারাপ। এর মধ্যেও ছোট খাটো স্ট্রোক হয়ে গেছে একটা। বিছানা ছেড়ে ওঠা নিষেধ এখন।

...আগে থাকতে হঠাৎ হঠাৎ মনে ইদানীং কেমন যেন ছায়া পড়ে মীনার। মনে হয় কিছু যেন ঘটবে। সেদিনও এক নামী হোটেলে আসার পর লোকটার দিকে চেয়ে সেই রকমই মনে হচ্ছিল মীনার। বাইরে অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। আনন্দ করে মদে ডুবছে সকলে। শুধু এই একজন প্রথম বারের গেলাস নিয়ে বসে আছে। গম্ভীর। মাঝে মাঝে ওর দিকে তাকাচ্ছে। দেখছে। আপিসে আজও শুনেছিল বাবার শরীর খারাপ। সেই কারণে কিনা বুঝল না।

চঞ্চল রায়চৌধুরী হঠাৎ ওর কাছে এসে বলল, একটা দরকারী কথা আছে, শুনে যাও।

হাত ধরে করিডোর পেরিয়ে একটা সুইট-এ নিয়ে এলো তাকে। ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল।

মীনা আঁতকে উঠল, এখানে কেন?

সে হাসতে লাগল বলল, এই সুইটটা আজ আমি রিজার্ভ করে রেখেছি। আজ আমার জন্মদিন, উপহার না নিয়ে আমি এ ঘর থেকে বেরুচ্ছি না।

মীনা অনেক অনুনয় করেছে, অনেক মিনতি করছে। বলেছে, তোমার বাবার শরীরের যা অবস্থা, এদিকে কিছু গণ্ডগোল হয়ে গেলে মুশকিলে পড়ব। কথা শেষ হবার আগেই বুকে টেনে নিয়েছে। মুখ দিয়ে মুখ বন্ধ করেছে। তারপর আলতো করে শয্যায় এনে ফেলে বলেছে, আমি কাঁচা ছেলে নই, গণ্ডগোল হলেই হল।

....তারপর স্বর্গ কি নরক মীনা জানে না। মীনা হারিয়ে গেছে।

আরো দু'মাস এই সুইট চঞ্চল রায়চৌধুরীর দখলেই ছিল। বন্ধু বান্ধবীদের নিয়ে কোন কোন দিন এ ঘরেই আসর বসেছে। কোন দিন বা নিঃশব্দে ওরা দুজনে এসেছে। এই ঘরটাও অদ্ভুত টানে মীনাকে। সমস্ত ভয়-ডর জলাঞ্জলি দিয়ে না এসে পারে না। স্বপ্নের মানুষ ডাকলে সে না এসে পারবে কি করে? স্বপ্নের মানুষ এখন আরো ঢের ঢের কাছের মানুষ তার।

কিন্তু অচেতন মনে কি যেন ভয় একটা। মীনা নিজেকেই চোখ রাঙায় তখন, এই মানুষকে অবিশ্বাস?

...অস্বস্তির ছায়াটা বড়ই হতে থাকল তবু। আপিসে ছোট সাহেবের হাব-ভাব বদলাচ্ছে। মীনা সেটা বিশ্বাস করতে চায় না। ভাবে, আপিসে দরকার পড়লে এখন অন্য স্টেনো চেয়ে পাঠায়, ওর সঙ্গে কথা বলে না, ওকে ডাকে না—সেটা আর সকলের চোখে ধুলো দেবার জন্যে একটা চাল।

হোটেলে দেখা হয়। কিন্তু তখন আবার বেশি মদ গেলে। নির্জন আলাপের বা বোঝাপড়ার অবকাশ মেলেই না বলতে গেলে।

মীনা চমকে ওঠে। ইচ্ছে করে করে না তো এ রকম?

নিজেই দ্বিগুণ আস্থায় সেটা বাতিল করে। তা কখনো হয়?

কিন্তু ভিতরের অস্বস্তির ছায়াটা এমন ঘন হয়ে উঠছে কেন? আপিসে কিছু বলে না, আবার হোটেলের সুইটেও মাঝে মাঝে পাত্তা মেলে না। ওদিকে বাবার খোঁজ নিলে বলে, ভালো।

তাহলে কেন? কেন—কেন—কেন?

মর্মান্তিক জবাব পেল দু'মাসের মাথায়। এই দিন সেটা। জন্মদিন। আর একজনের জন্মদিনে সর্বস্ব দিতে হয়েছিল। নিজের জন্মদিনে সর্বস্ব নেবার পণ। কি উপলক্ষে হোটেলে সেদিন আর এক দম্পতির আমন্ত্রণ ছিল। এও এক রকম ভালোই হয়েছে। নিজেদের স্যুইট ফাঁকা পাবে।

....একটু বেশি যত্ন নিয়েই মীনা সাজসজ্জা করল সেদিন। ততদিনে গলির দ্বিতীয় ঘরটা পেয়েছে, আর প্রথমেই সেই ঘরে বড় আয়না লাগানো ড্রেসিং টেবিল এসেছে।

হোটেলের একটা বড় ঘরে আপ্যায়নের ব্যবস্থা। পুরুষের জোড়া জোড়া চোখ ঘুরে ফিরে তার এই দেহের সঙ্গে লেপটে থাকছে সেটা ভালোই অনুভব করছে সেই থেকে। কতজন হাতে কাঁধে হাত দিয়ে স্তুতি নিবেদন করে গেছে—তোমাকে যা দেখাচ্ছে ম্যাডাম, আমাদের নেশা আর জমছে না। কেউ বলেছে, ইউ আর মোস্ট চার্মিং টু নাইট।

মীনার প্রচ্ছন্ন মনোযোগ শুধু একজনের দিকে। চঞ্চল রায়-চৌধুরীর দিকে। চার পাঁচ বার গেলাস বদল হবার পরেও তার নেশা যেন ঠিক মতো জমছে না। ঘুরো ফিরে লোলুপ দৃষ্টিটা ওর দিকে ধাওয়া করছে সেই থেকে। মীনা এক একবার তার গা ঘেঁষে গিয়ে বসছে কিন্তু হেসে হেসে কথা বলছে অন্য লোকের সঙ্গে।.... লোকটার উসখুসুনি ক্রমে বাড়ছে। আরো বাড়ুক, মীনা তাকে পাগল করে দিতে চায়।

রাত ন'টা তখন। এক ফাঁকে তার পাশে বসে হাতের ওপর মৃদু চাপ দিল। বলল, চুপচাপ বেরিয়ে এসো, কথা আছে।

নিজে উঠে বাইরে চলে গেল। একটু বাদেই চঞ্চল রায়চৌধুরী তার পাশে। জ্বালচে মুখ। খুব কম গেলেনি। পা দুটোও সম্পূর্ণ বশে নেই মনে হয়। তবু আর এক বাসনায় দ্বিগুণ জ্বলছে তখন। দু'মাস আগে চঞ্চল রায়চৌধুরী মীনার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেছল,

আজ মীনা তার হাত ধরে তাকে টেনে নিয়ে করিডোর পেরিয়ে নিজেদের সুইটে ঢুকল। এ ভাবে ধরে আনতে পারার ফলেই সুন্দর দু'সারি দাঁত হাসিতে ঝকমক করে উঠল।

চঞ্চল রায়চৌধুরী আনন্দে আত্মহারা। হাতের ব্যাটনটা বিছানায় ছুড়ে দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরল ওকে। চুমু খেতে খেতে বলল, আমিও সেই থেকে এ রকম সুযোগই খুঁজছিলাম, তুমি সেই সন্ধ্যে থেকে আমাকে যাকে বলে একেবারে পাগল করে দিয়েছ

মদের গন্ধের ঝাপটা লাগছে মীনার নাকে। মদ খেলে এই লোককে কাছে ঘেঁষতে দিতে চায় না। কিন্তু আজ সহ্য করতে হবে। ঠেলে সরাবে না।

তার বাহুলগ্ন হয়েই মীনা হাসছে মুখের দিকে চেয়ে। কথা বলছে না। শুধু হাসছে নিঃশব্দে। যত হাসছে তত নেশায় আগুন ধরছে লোকটার। ওকে ঠেলে শয্যার দিকে আনতে চাইছে।

কিন্তু তখনো মীনা হাসছে আর মাথা নাড়ছে।

কি মুশকিল! তুমি ভাবছ বেজায় নেশা হয়েছে? তোমার কাছে কোন নেশা লাগে!

আস্তে আস্তে মীনা নিজেকে ছাড়িয়ে নিল একটু। মদের গন্ধটা বিচ্ছিরি লাগছে কিন্তু সেটা বুঝতে দিতে চায় না। তেমনি হেসেই বলল, দু'মাস আগের সেই প্রথম রাতটার কথা মনে আছে?

চঞ্চল রায়চৌধুরী ঠিক বুঝে উঠল না।—আছে, কেন বল তো?

তোমার জন্মদিন ছিল। জোর করেই উপহার আদায় করেছিলে।

ঠিক ঠিক।...তার কি?

আজ আমার জন্মদিন। উপহার চাই।

ওয়াণ্ডারফুল! আবার দু'হাত বাড়াল—উপহার আদায় করার জন্যে আমাকে ধরে এনেছ?

মীনা সরে গেল একটু।—হ্যাঁ। রেজিস্ট্রি আপিস থেকে আমি ফর্ম এনে রেখেছি। কালই নোটিস দিতে হবে।

ধাক্কা খেল যেন।—কিসের নোটিস?

বিয়ের। আর তারপর কালই আপিসে অ্যানাউন্স করতে হবে। কি রকম বিচ্ছিরি কানাকানি শুরু হয়েছে তুমি জানো না।

হ্যাং ইওর কানাকানি, আই ডোণ্ট কেয়ার!

নেশার ঘোরে কিনা জানে না, কিন্তু যেভাবে বলল মীনা চমকেই উঠল প্রায়।

চঞ্চল রায়চৌধুরী ভুরু কুঁচকে ওকে দেখল একটু।—গণ্ডগোল কিছু হয়নি তো, এত ব্যস্ত হবার কি আছে?

সানুনয়ে মীনা বলল, গণ্ডগোল কিছু হয়নি, কিন্তু আমার মাথার মধ্যে কি রকম গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে। লক্ষ্মীটি, আজকের দিনে তুমি আমাকে কথা দাও।

মুখ লাল, চাউনি ঘোরালো হয়ে উঠছে ক্রমশ।—কথা না দিলে আজ তুমি ধরা দিচ্ছ না, কেমন?

সে কথা হচ্ছে না, কথা দেবে না-ই বা কেন?

কেন দেব না, কেমন? কেন দেব না সেটা বোঝার মতো বুদ্ধি তোমার ঘটে আছে? তবু শুনতে চাও? সুন্দর মুখ রাগে বীভৎস হয়ে উঠছে।—ছেনাল মেয়েকে কেউ বিয়ে করে ঘরে তোলে না, এই জন্যে কথা দেব না—বুঝলে? তোমার মা বিয়ের চার বছরের মধ্যে অন্য লোকের সঙ্গে হাওয়া হয়ে গেছিল সে খবর আমার জানতে বাকি? তার মেয়ে হয়ে তুমি কারো ঘরে থাকবে? ঘর করবে? কেন কথা দেব না, এবার বুঝেছ? নাও, কাম্ অন্—

হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টানে ওকে বিছানার ওপর এনে ফেলতে চেষ্টা করল।

মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত বুকের ভিতরটা ভেঙে গুঁড়িয়ে একাকার হয়ে গেল মীনার। ছিটকে সরে দাঁড়াল। দু'চোখ টান করে দেখছে। এমন কদর্য বীভৎস মানুষ আর বুঝি জীবনে দেখেনি।

তারপর কি যে হয়ে গেল মাথার মধ্যে মীনা জানে না। হিংস্র বাঘিনীর মতোই ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইল লোকটার ওপর। সেই সঙ্গে চিৎকার করে উঠল, ইউ সোয়াইন্, বেইমান, লম্পট—

লোকটার ওই মুখ ফালা ফালা করে দেওয়া গেল না। প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে আবার বিছানার ওপর উপুড় হয়ে পড়ল সে।

আর, তারপর....

বিদ্যুতের একটা জ্বলন্ত স্পর্শ কাঁধের কাছ থেকে পিঠের কিছুটা ছিঁড়ে দিয়ে গেল বুঝি। চামড়া মাংস বিদীর্ণ করে সেই আঘাত তার সত্তাসুদ্ধ কাঁপিয়ে দিল বুঝি। অস্ফুট একটা আর্তনাদ করে দরজার দিকে ছুটল মীনা। দরজা খুলে সোজা নীচে। সমস্ত পিঠ জ্বলে যাচ্ছে পুড়ে যাচ্ছে।

ট্যাক্সিতে উঠেছিল। কোন্ পথের নির্দেশ দিয়েছিল মনে নেই। ট্যাক্সি মাসির বাড়ির দরজায় এসে থেমেছে। মেসোর মারফৎ চাকরিটা হয়েছিল। অচেতন মন তাই প্রথমেই এদিকে ঠেলেছে কিনা জানে না।

মাসি ছুটে এলো। কিন্তু তখন আর দাঁড়ানোরও শক্তি নেই মীনার। মাসির বিছানাতেই উপুড় হয়ে পড়ে ডুকরে কেঁদে উঠল।

পিঠে হাত দিয়েই অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল মাসি, এ কি হয়েছে। কি সর্বনাশ করে এলি ?

পিঠের যন্ত্রণা বড় কি আর কোন যন্ত্রণা, মীনা জানে না। সেই যন্ত্রণায় সমস্ত শরীর কুঁকড়ে যাচ্ছে তার। কিন্তু মাসিকে ঠিক মতো জানলে এখানে আসার মতো ভুল মীনা করত না। হঠাৎ ক্ষিপ্ত আক্রোশে দু'হাতে চুলের মুঠি ধরে টেনে তুলল তার।—কি সর্বনাশ করে এলি বল্ শিগ্‌গীর হতভাগী। বল্ বল্। পাগলের মতোই চুলের মুঠি ধরে মাথাটা ঝাঁকাতে লাগল।—তোর ঢলানির খবর আমার কানে এসেছে, সব খেয়ে বসে আছিস কিনা বল্ শিগ্‌গীর—তোকে আমি কুচি কুচি করে কাটব তাহলে।

আশ্চর্য, সেই মুহূর্তে যেন নিজের ওপর দখল ফিরে আসতে লাগল মীনার। ও ভুল জায়গায় এসেছে। এখানে ক্ষমা নেই, আশ্রয় নেই। এখানে সত্যের ঠাঁই নেই।

ধাক্কা মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। হিসহিস করে বলল,

সর্বনাশ একেবারে হয়ে গেলে আর তোমার কাছে আসব কেন—মেসো যেখানে চাকরি দিয়েছিল ;সেখানকার মনিব হোটেলে নিয়ে গিয়ে জন্মদিনের এই উপহার দিয়েছে!

মাসি থমকে তাকালো। তারপর বলে উঠল, দূর হ', দূর হ,—আর তোর মুখ দেখতে চাইনে!

তিন চারটে দিন পাগলের মতো কেঁদেছে মীনা। বাবার কাছে বলেছে, কিছুদিনের ছুটি নিয়েছে, ও চাকরি ভালো লাগছে না। আবার ঘরেও তিষ্ঠোতে পারেনি। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছে। মাথায় কেবল আগুন জ্বলছে। জ্বলছে।

....এই পথেই হঠাৎ দেখা একজনের সঙ্গে। মামাতো ভাই নিখিলদার অন্তরঙ্গ সঙ্গী ছিল। নিখিলদা জেলে যাবার পর থেকে আর দেখা হয়নি। নাম সুচারু কর্মকার। এই লোকটাকেই সব থেকে কঠিন ধাতের মানুষ মনে হত মীনার। এও এখন পুলিসের নজর এড়িয়ে দিন কাটায় কিনা জানে না। দেশের রাজনৈতিক দুর্যোগের অবসান হয়নি তখনো। বদলা নেওয়া-নেওয়ির পব একেবারে থেমে যায়নি। একটা দুটো খুন জখম লেগেই আছে।

মাথার আগুন যে-ভাবে জ্বলছে ;হিতাহিত জ্ঞান নেই মীনার। বিচার বিবেচনার ধৈর্য নেই। সুচারু কর্মকারকে বাড়িতে ধরে নিয়ে এলো। নিজের কতটা গেছে শুধু সেটুকু গোপন রেখে কেবল ম্যানুফ্যাকচারিং ফার্মের পাশবিক চরিত্রের কথা বলল। কত মেয়ের সর্বনাশ করেছে তার বানানো ফিরিস্তি দিল। আর শেষে, তার বাসনার শিকার হাত-ছাড়া হবার ফল দেখাল তাকে। কাঁধ আর পিঠের সেই ক্ষত। মীনার মাথায় প্রতিহিংসার আগুন, কোন লজ্জা-সরমের ধারে ধার না সে। কাঁধের ব্লাউজ সরিয়ে সেই গদ দগে ক্ষতচিহ্ন অনায়াসেই দেখাতে পারল।

সুচারু কর্মকারের বরাবরই মুখের বিকার কম। বলল, দলবল সব ছেড়ে গেছে, দেখি কি করা যায়।

এর ঠিক দু'দিন বাদে খবরের কাগজ খুলেই হিংস্র উল্লাসে লাফিয়ে উঠল মীনা। প্রথম পাতাতেই চোখ জুড়িয়ে যাবার মতো খবর। বড়লোকের খবর প্রথম পাতাতেই থাকবে বই কি।....অমুক কোম্পানির অন্যতম কর্ণধার চঞ্চল রায়চৌধুরী নিজে ড্রাইভ করে বেশি রাতে হোটেল থেকে ফিরছিল। এক নির্জন রাস্তায় কে বা কারা গাড়ি আটক করে টেনে নামিয়েছে এবং প্রহারে প্রহারে জর্জরিত করে অজ্ঞান অবস্থায় রাস্তায় ফেলে রেখে গেছে। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, কিন্তু আঘাত এত বেশি যে এখন পর্যন্ত জ্ঞান হয়নি।

এর পাঁচ সাত দিনের মধ্যে অন্তত সুচারু কর্মকার এলে এবং পুরস্কারের দাবি করলে মীনার হয়তো অদেয় কিছু থাকত না।

কিন্তু আশ্চর্য, ওই লোকটার আর দেখা মেলেনি।

তবু বুক জুড়িয়েছে মীনার? মন জুড়িয়েছে? আজ হোক কাল হোক বা দু'মাস পরে হোক চঞ্চল রায়চৌধুরী দেহের আঘাত সামলে উঠবে। আবার সচল হবে। কিন্তু মীনা কি করবে? এত বড় আত্মার আঘাত সে সামলাবে কি করে।

এরই মধ্যে ডাকে চিঠি পেল একটা। আত্মার ক্ষত অত বড় না হলে অনেকখানি জ্বালা জুড়াতে, অনেকটা ঠাণ্ডা হতে পারত সে।

চিঠি সময় গাঙ্গুলির। লিখেছেন, মীনা মা, এত অল্প সময়ের মধ্যে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করে ওঠা গেল না। এ-চিঠি তোমার হাতে আসার আগে আমি অনেক দূরে চলে গেছি। মাস চার-পাঁচ বাদে ফিরব। তখন দেখা হবে, কথাও হবে। চাকরির কথা বাদ দিলেও তোমার মনের দিক থেকেও বেশ ক্ষতি হয়ে গেছে অনুমান করতে পারছি। শুধু একটা কথা মনে রেখো, ভুলের সমুদ্র থেকেও ডাঙায় ওঠার আশা না হারালে জীবনের কোন ক্ষতিটাই বড নয় বা শেষ কথা নয়।

চিঠিটা পেয়ে মীনা অঝোরে কেঁদেছিল।

কিন্তু এই সান্ত্বনারই বা পরমায়ু কতটুকু? তাছাড়া কত বড় ক্ষতি হয়ে গেছে ভদ্রলোক জানেন না বলেই এমন কথা লিখতে পেরেছেন, এ-ভাবে সান্ত্বনা দিয়েছেন।

টোপ ফেলল প্রমথ কাকা। বলল, তোর মতো মেয়ের পক্ষে এই দিনে টাকা রোজগার করা তো সহজ ব্যাপার, কত পয়সাওয়ালা লোক কত রকম কাজে মেয়েদের সাহায্য নেয়—কিন্তু ও-সব কাজ কি তোর পোষাবে?

মীনার মাথারই ঠিক নেই তখন। যেখানে নেমে আসতে হয়েছে তারপর আর বাকি কি? সরাসরি জিজ্ঞাসা করল, কি কাজ, নিজের মান সম্মান বাঁচিয়ে চলা শক্ত হবে?

কি যে বলিস ঠিক নেই, আমি হলাম গিয়ে কাকা, তোর ওই আপিসের পাঁচটা বাজে ছেলের মতো লোকের খপ্পরে নিয়ে গিয়ে ফেলব নাকি তোকে! এ বড় বড় ব্যাপার, নিজের মান সম্মান বাঁচানো নিজের হাতে—কাজ করে দিবি, টাকা গুণে নিয়ে চলে আসবি। বিবেচনা করে দেখ…

বিবেচনা করার আগে প্রমথ কাকার মুখখানাই ভালো করে দেখেছে মীনা। …ইন্‌সিওরেন্সের দালালীর কাজে আপিসে হানা দিত না, বোঝা যাচ্ছে।

…প্রমথ কাকা পথ দেখিয়েছে, পথ চিনিয়েছে শুধু। তার বদলে দু'দিক থেকেই টাকা আদায় করে অম্লান বদনে নিজের পকেটে পুরেছে। কিন্তু চোখ-কান খোলা রেখে আর মাথা খাটিয়ে সে-পথ প্রশস্ত করার কৃতিত্ব সবটুকুই মীনার। এমন কি, কিছুদিন না যেতে প্রমথ কাকাই উল্টে ওর মুখাপেক্ষী হয়ে উঠেছে।

এই কলকাতা শহরের দিন আর রাতের চেহারায় রাত-দিন তফাৎ। চঞ্চল রায়চৌধুরীর সহচরী হিসেবে রাতের ভোগের চেহারা কিছুটা দেখা ছিল। এখন যাদের সান্নিধ্যে আসছে, ভোগটা তাদের কাছে উদ্দেশ্য সাধনের একটা খোলস মাত্র। সুড়ঙ্গ পথে চলাচল করে

যারা লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করছে, ওপর-ওপর মক্ষীরাণীর ভূমিকা নিয়ে তাদের নিরাপদ রাখাটাই কাজ। হোটেলে খাও দাও ফুর্তি কর, আর সেই ফাঁকে তাদের নির্দেশটুকু যথাযথ পালন কর। তোমাকে দেখে কেউ সন্দেহ করবে না, শুধু মুগ্ধ হবে। আইনের দরজা বা নীতির দরজা যারা আগলে বসে আছে, তোমার সুন্দর মুখের সুচারু আমন্ত্রণে তারা যেন ঘাঁটি ছেড়ে এগিয়ে আসে। তাহলেই তোমার প্রাপ্য তোমাকে আমরা মিটিয়ে দেব। মক্ষীরাণীর এই ভূমিকাটুকুর জন্যে তোমাকে কতটুকু দিতে হবে সে তুমি জানো।

দিতে হয়নি। তার চাল-চলন কথা-বার্তা হাসি-খুশির মধ্যেও সরল বিশ্বাসের দাবিটুকুই যেন সব থেকে বড় সুষমা তার। তাদের মন ভরে, প্রলুব্ধও হয়। কিন্তু চট্‌ করে হাত বাড়াতে পারে না। এটুকু স্বাতন্ত্র্য আর ব্যক্তিত্ব বজায় রাখার মাধুর্যও অনায়াসেই রপ্ত করে ফেলেছে। কাজ হাসিল হয়ে গেলে তারপর আর ওকে পাচ্ছে কে! দৈবাৎ বিপাকে পড়ে গেলেও পিছলে বেরিয়ে আসার জাদু জানা আছে। ছলে কৌশলে দেদার মদ গেলাও। তোমার সুন্দর মুখের হাসি আর কালো চোখের কটাক্ষ হেনে হেনে গেলাসের পর গেলাস বদলে দাও। তখন সাধ আর সাধ্যের যোজন তফাৎ হয়ে যাবে। সেই ফাঁকে তুমি উধাও হয়ে যাও।

থোকে থোকে ভালো টাকাই আসছে। কিন্তু এ-কাজও মীনা আর বেশিদিন করতে পারবে না বুঝছে। সেটা ওর নিজের দোষ। পুরুষ তার শত্রু। পুরুষ তার মাকে খেয়েছে, ওকে খেয়েছে। এক-একবার টাকা হাতে আসার পরে নিজেই আবার বেনামী চিঠি পাঠিয়ে সুড়ঙ্গ পথের কারবারীদের হদিশ দিয়ে দেয়। বেনামী চিঠি পাঠিয়ে আইন বা নীতিভ্রষ্টদের বিরুদ্ধে নানা তথ্যের ফিরিস্তি পেশ করে।

গত কয়েক মাসের মধ্যে হঠাৎ-হঠাৎ জনা দুই-তিন চোরাই চালান কারবারী ধরা পড়েছে। জনা দুই হোমরা-চোমরা সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধেও তত্ত্ব তল্লাসী শুরু হয়েছে। পুরুষের বিরুদ্ধে এতখানি হিংস্র আক্রোশ পুষে এই জীবিকার পথে কতটুকু আর এগনো সম্ভব?

তার প্রয়োজন হল না। ছ'মাসের মাথায় চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট সমর গাঙ্গুলি বিদেশ থেকে ফিরেই ওকে বাড়িতে দেখা করার জন্যে খবর দিলেন। সাত-পাঁচ ভেবে মীনা এক সকালে গিয়ে উপস্থিত হল তাঁর কাছে। বাড়িতে আর কে আছে, মীনা তাও টের পেল না সেদিন।

তাকে দেখেই ভদ্রলোক খুশি। হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, ভালো ছিলে?

এই হাসি আগের থেকেও সুন্দর লাগল মীনার। হঠাৎ একটা প্রণাম করতে ইচ্ছে করল তাঁকে। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। তারপর হেসেই জবাব দিল, ছ'মাস ধরে চাকরি নেই, ভালো থাকব কি করে?

ভদ্রলোক মুখের দিকে চেয়ে রইলেন একটু। দৃষ্টি গম্ভীর। কিন্তু মীনার সরল মুখ বিদীর্ণ করে কতটুকু আর দেখা সম্ভব? অস্বস্তি কাছে ঘেঁষতে দিল না মীনা।

চাকরি করবে?

একটা ভালো জায়গায় ব্যবস্থা করে দিলে বেঁচে যাই।

আগের ব্যবস্থাটা ভালো জায়গায় হয়েছিল কি মন্দ জায়গায় তা নিয়ে একটি কথাও বললেন না সমর গাঙ্গুলি। ভাবলেন একটু। তারপর উঠে ঘরের কোণে গিয়ে টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিলেন।

কার সঙ্গে কি কথা হল মীনা জানে না। ফিরে এসে একটা ছোট চিঠি লিখলেন। বললেন, এঁর সঙ্গে দেখা কর—আমার এক মস্ত অ্যাটর্নী বন্ধুর ছেলে। এও অ্যাটর্নী, বন্ধু বেঁচে নেই—বাপের ব্যবসা আরো বড় করে তুলেছে। মাইনে আগে যা পেতে তাই পাবে।

খামের ওপর নাম লেখা—বীরেন গুপ্ত, অ্যাটর্নী। তার নিচে ঠিকানা।

পরের দিনই চিঠি নিয়ে বীরেন গুপ্তর আপিসে গেছল মীনা।

খাম খুলতে খুলতে বীরেন গুপ্ত হেসে বলল, আবার চিঠি কেন, কাকার টেলিফোনের হুকুমই যথেষ্ট।...কাকা বলছিলেন, তাঁর মেয়ের মতো একজনকে পাঠাচ্ছেন, তাহলে আমার বোনের মতো....তাই প্রথমেই ফয়সলা করে রাখছি, তুমি বললে আপত্তি নেই তো?

প্রথম আলাপেই বেশ প্রসন্ন মেজাজের মানুষ মনে হয়েছে ভদ্রলোককে। কিছুদিনের মধ্যে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতেও অসুবিধে হয়নি। নিজে প্রচুর পরিশ্রম করে, তার মধ্যে সর্বদা হাসি খুশি ফুর্তির মেজাজ। কিছুদিনের মধ্যে তার স্ত্রী সোমা গুপ্তর সঙ্গেও খাতির হয়েছে। স্বামীকে কাজ থেকে ঠেলে তোলার জন্যে সেই মহিলা মাঝে-মাঝে অফিসে এসেই হানা দেয়। স্ত্রীটিও সুরসিকা। তিন চার দিনের আলাপের পরেই স্বামীর উদ্দেশ্যে ভ্রূকুটি করেছে—এই জন্যেই আপিস থেকে বাড়ি ফিরতে আজকাল আরো দেরি?

বীরেন গুপ্ত ছদ্ম কোপে চোখ পাকিয়েছে, খবরদার, বোন সম্পর্ক পাতিয়েছি! তারপর নিজেই হেসে বলেছে, তবে বোন সম্পর্কটা তুমি পাতালে মন্দ হয় না, একটি সুন্দরী শালী লাভ হয় আমার।

সেই থেকে সোমাকে দিদি ডাকে মীনা।

কমল গাঙ্গুলির সঙ্গে এই আপিসেই পরিচয় মীনার। বীরেন গুপ্ত আলাপ করিয়ে দিয়েছে, আমার ছোট ভাইয়ের মতো বন্ধু বলতে পারো—কমল গাঙ্গুলি—মাল্‌টি-মিলিয়নেয়ার বললে খুব বেশি বলা হবে না। হোয়াইট্ টাওয়ারের নাম শুনে থাকবে, তার ইস্টার্ণ জোনের চেয়ারম্যান।

কিন্তু আশ্চর্য, সমর গাঙ্গুলির নিজের ভাইপো যে, এ-কথাটা অনেকদিন পর্যন্ত দুজনের কেউই বলেনি তাকে।

বীরেন গুপ্তর সঙ্গে অন্তরঙ্গতার সূত্রে এই একজনও সহজেই আপনার জনের মতো হয়ে গেছে। এমন এক মস্ত মানুষ, তার ওপর বীরেনদার ঢালা প্রশংসা—মীনার ভক্তি শ্রদ্ধা স্বাভাবিক। কিন্তু ওই লোকেরও তার প্রতি একটু প্রচ্ছন্ন আগ্রহ লক্ষ্য করেছে মীনা। গোড়ায় গোড়ায় পুরুষের চাপা লোভ ভেবেছে সেটা। কিন্তু পরে,

সে-রকমও মনে হয়নি। পুরুষের অভিলাষের আঁচ যতই সংগোপন থাক, মীনার ভুল হবার কথা নয়। অথচ ওর সম্পর্কে আগ্রহ যে একটু আছে তাও অনুভব করতে পারে। বীরেন গুপ্ত হেসে হেসে যখন তখন বলে, কমল তোমার খুব প্রশংসা করছিল, তোমার মতো ব্রাইট মেয়ে নাকি কম দেখা যায়।

হাসে মীনাও। কিন্তু মনের পর্দায় আঁচড়ও পড়ে।

আট ন'মাস বাদে হঠাৎই একদিন সমর গাঙ্গুলির সঙ্গে কমল গাঙ্গুলির সম্পর্কটা মীনা জানতে পারল। সেও কমল গাঙ্গুলি ওভাবে কথাটা তুলল বলে। বিকেলের দিকে এসেছিল। বীরেন গুপ্ত কি কাজে বেরিয়েছে। কমল গাঙ্গুলি ওর সঙ্গেই গল্প করছিল।

হঠাৎ সামনে ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, কাকার সঙ্গে তোমার কত দিনের পরিচয়?

মীনারই অনুরোধে সেও তাকে 'তুমি' করে বলছে।—আপনার কাকা কে?

সমর গাঙ্গুলি।

আপনার কাকা?

হেসে কমল গাঙ্গুলি বলল, একেবারে নির্ভেজাল নিজের কাকা।

কি আশ্চর্য, এতদিন আমি জানতুম না তো। তারপর জবাব দেওয়া হয়নি মনে হতে বলল, খুব বেশি দিনের নয়, বছর দুই হবে···· আমার মেসোমশাইয়ের বন্ধু, তিনিই প্রথম তাঁর কাছে চিঠি দিয়ে আমাকে পাঠিয়েছিলেন। সেই থেকে তাঁর স্নেহ পেয়ে আসছি।

তোমার মেসোমশাই কে বল তো?

নাম বলল।

কি করেন?

কলেজে পড়ান।

একটু ভেবে জিজ্ঞাসা করল, কোন্ চাকরির জন্য চিঠি দিয়েছিলেন ····সেই কেবল্ ম্যানুফ্যাকচারিং ফার্মের চাকরি?

মীনা সচকিত হঠাৎ।—হ্যাঁ···আপনি জানলেন কি করে?

না···বীরেনদার মুখে শুনেছিলাম হয়তো। কাকা তাঁকে বলে থাকবেন।

মীনা ভিতরে ভিতরে আবারও অবাক একটু। কারণ বীরেন গুপ্ত তার আগের চাকরির প্রসঙ্গ কখনো তোলেনি।

যাই হোক, বীরেন গুপ্তর আপিসেই প্রায় সাড়ে তিনটে বছর মোটামুটি আনন্দের মধ্যেই কেটেছিল তার। এর মধ্যে আরো অন্তরঙ্গ কাছের মানুষ হয়ে উঠেছে কমল গাঙ্গুলি। তার স্ত্রীর সঙ্গেও হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। সকলে মিলে আউটিং-এ বেরোয় ছুটিছাটায়, হোটেল রেস্তোরাঁয় খেয়ে হৈ-চৈ আনন্দের মধ্যে ছুটির দিন কেটে যায়।

তারপর, অর্থাৎ দেড় বছর আগে আবার একটা পরিবর্তন। কমল গাঙ্গুলি প্রায় দ্বিগুণ মাইনে দিয়ে হোয়াইট্ টাওয়ারে টেনে নিয়েছে তাকে। আর মাস কয়েকের মধ্যে পুরোপুরি ওয়েলফেয়ার অফিসার হতে পারবে সেই আশ্বাসও দিয়েছে।

প্রস্তাব শুনে মীনা নিজেই হকচকিয়ে গেছল। বীরেন গুপ্ত হেসে হেসে বলেছে, আমি আগেই জানি ও আমাকে কানা করবে।····তা যাও, আমার এখানে আর কতকুট্ প্রসপেক্ট, ওর ওখানে গেলে আরো ঢের বড় বড় কানেকশানের সুযোগ তো পাবে।

কিন্তু এবারে আর নিজের বুদ্ধিতে সবটা চলতে চায়নি মীনা। সোজা এসে সমর গাঙ্গুলিকেই জিজ্ঞাসা করেছে, নতুন চাকরি নেবে কি না। সমর গাঙ্গুলি ভেবেছেন একটু। তারপর জিজ্ঞাসা করেছেন, কমল নিজে অফার দিয়েছে ?

মীনা মাথা নেড়েছে। তাই।

আরো খানিক চিন্তা করে তিনি বলেছেন, চাকরির উন্নতি যেখানে সেখানে যেতে আর বাধা কি! কমল যখন অফার দিয়েছে ভেবে চিন্তেই দিয়েছে।

ভাইপো আর ভাইপোর স্ত্রীর সঙ্গে হৃদ্যতার খবর ভালোই রাখেন। তাই আপত্তি করার কারণ নেই।

…এই দেড় বছরে মীনার চোখ কান আরো যে কত খুলে গেছে ঠিক নেই। যত খুলেছে তত যেন তার চাল-চলনের মাধুর্য আরো বেড়েছে। কমল গাঙ্গুলির খাতিরে উঁচু মহলের অভিজাত চূড়ামণিদের সঙ্গে যোগ তার। এর মধ্যে সংগোপনে দুই একজন বিত্তশালীর মুশকিল আসানও করে দিয়েছে মীনা দত্ত। শুধু কমল গাঙ্গুলি জানে। সবুজ সংকেতের মতলবটা তার কাছ থেকেই আসে। মীনা বুঝতে পারে। মীনার কারো কাছে যেতে হয়নি, চুপিচুপি তারাই এসে সাহায্য নিয়েছে। এখানে ঢের উঁচুদরের মক্ষীরাণীর ভূমিকা তার। এর মধ্যে কারো স্থূল হামলার কোন প্রশ্ন নেই। কমল গাঙ্গুলির অনুগত সচিব হিসেবে সেদিক থেকে সকলেই সমীহ করে। প্রতিষ্ঠানের দৌলতে কতজনের বিরাট অঙ্কের কালো টাকা সাময়িক ভাবে নিরাপদ হল, কত কালো টাকা কত সহজে না সাদা হয়ে গেল। কাগজে কলমে বড় বড় দান গ্রহণ করে সেটা আবার প্রতিষ্ঠানের ভুয়ো চ্যারিটির খাতে চালান দিলে কে ধরছে? এসব মক্কেলের সংখ্যা অবশ্যই খুব কম। কিন্তু একটা ছুটো কাজ করলেও যে টাকা নিজের ভাগে আসে, সেটা কম না মোটেই। এসব তুচ্ছ ব্যাপার কমল গাঙ্গুলি দেখেও দেখে না।

এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দেবার পর থেকেই মীনার আগের সেই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে। কমল গাঙ্গুলির এত আন্তরিকতা এত উদারতার পিছনে উদ্দেশ্য কিছু আছেই। কি, সেটা অনেক মাথা ঘামিয়েও বুঝে উঠছিল না। এখনো জানে না। কিন্তু এতদিনে কমল গাঙ্গুলি একান্ত বিশ্বাসের দোসর করে নিয়েছে তাকে। মুখ খুলেছে। বলেছে, একটা কাজ করে দিতে হবে, এ ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট অ্যাসাইনমেন্ট—অ্যাণ্ড ভেরি সিক্রেট ট্যু। আর কাল বলেছে, দিন কতকের জন্যে ওকে বাইরে যেতে হবে—গরমে কোন ঠাণ্ডা জায়গায় যেতে হবে।

…আয়নায় মীনার ধারালো কঠিন মুখখানা ঝকঝক করছে। দেখা যাক, দেখা যাক। আবার কি আছে সামনে দেখা যাক। পুরুষ

তার শত্রু। পুরুষ তার মাকে খেয়েছে। তাকেও খেয়েছে। কমল গাঙ্গুলিকেও মিত্র ভাবে না। তাকেও একদিন রসাতলে পাঠাবার সুযোগ পেলে দ্বিধা করবে না। আপাতত তার মুশকিল আসানটাই বড় লক্ষ্য হোক। তার জন্যে আবার কোন পুরুষের বুকেই ছুরি বসাতে হবে হয়তো। নইলে তার ডাক পড়ত না। নইলে বলত না, এ-কাজ শুধু ওকে দিয়েই হতে পারে।

মীনার আপত্তি নেই। টোপ হতে আপত্তি নেই। পুরুষের বুকে ছুরি বসাতে আপত্তি নেই। নরক নরক নরক—পুরুষের সমস্ত প্রতিশ্রুতির আড়ালে কেবল নরক দেখে দেখে তার বুকের তলায়ও নরক জ্বলে সর্বদা। শত্রুবিনাশই তার একমাত্র লক্ষ্য। এই শত্রু নিয়ে ছিনিমিনি খেলার জন্যে পুরুষই তাকে টাকা যুগিয়ে আসছে। শত্রু ধরাশায়ী হলে মীনা জীবনের সেই প্রথম বিশ্বাসঘাতকের সত্তা-ছেঁড়া আর্ত মুখ দেখতে পায় যেন।

....সেই বিশ্বাসঘাতক এখন বড় ঘরের পরী বউয়ের কোমর জড়িয়ে ধরে সন্ধ্যায় গ্র্যাণ্ডে যায় আনন্দ করতে।

...কমল গাঙ্গুলির মুশকিল আসান হলে সে সহায় হবে। মীনার স্বপ্নের ঘর ধুলিসাৎ হয়েছে। চঞ্চল রায়চৌধুরীরও সুখের ঘরে আগুন জ্বলবে।

গাড়ি এলো। আর ড্রাইভারের সঙ্গে বীরেন গুপ্তর চিরকুট এলো একটা।

প্রথমে জন্মদিনের অভিনন্দন। তারপর গাড়ি নিয়ে সোজা তার

ওখানে চলে আসার নির্দেশ। দুপুরে তার ওখানেই লাঞ্চের ব্যবস্থা। রাতের ডিনার আসানসোলে। কারণ, এক বিজনেস ম্যাগনেটের টেলিফোন পেয়ে আজ খুব ভোরে কমল গাঙ্গুলি সেখানে চলে গেছে। মীনার জন্মদিনের সেলিব্রেশানটা আজ সেখানেই হবে। বীরেন গুপ্তও থাকবে। আজ রাতে ফেরার সম্ভাবনা নেই বাড়িতে সেটা জানিয়ে মীনা যেন তার ওখানে চলে আসে।

চিঠি পেয়ে মীনা দশ মিনিটের মধ্যে একটা বাড়তি শাড়ি আর জামা আর টুকিটাকি কিছু জিনিস গুছিয়ে নিল। তারপর বাবার ঘরে এসে তাকে যা জানাবার জানিয়ে প্রমথ কাকাকে বলল, আজ রাতটা এখানেই বাবার কাছে থেকে যেতে। রাতের খাওয়াটাও যাতে ভালো হয় বিল্টুকে সেই ব্যবস্থার কথা বলে যাচ্ছে।

গলি পেরুবার আগেই আবার বিরক্তি। দরজার কাছে বলু ঘোষের সীতা বউ দাঁড়িয়ে আছে। ওকে দেখে হাসল একটু। কৃতজ্ঞতার হাসি কিছু নয়, উল্টে যেন ব্যঙ্গের ছোঁয়া লেগে আছে। সেই সঙ্গেই বোঝাতে চায় টাকাটা পেয়ে বড় উপকার হল।

মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে মীনা গলির মুখে এসে গাড়িতে উঠল।

...শুধু জন্মদিন উপলক্ষ করেই যে কমল গাঙ্গুলি বীরেন গুপ্তর সঙ্গে ওকে আসানসোলে চলে আসতে নির্দেশ দিয়েছে বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। আজ ওর জন্মদিন, ওই ব্যস্ত মানুষের সেটা মনে করে বসে থাকারও কথা নয়। অথচ মনে আছে। নিজের স্বার্থেই আছে। মীনার কেমন মনে হল তার এই স্বার্থের সঙ্গে বীরেন গুপ্তও যুক্ত। তা না হলে তাকেও আসানসোলে যেতে বলত না। মুখ দেখে কারো ভিতর বোঝা সহজ নয়। বিচক্ষণ আর বুদ্ধিমান হলেও বীরেন গুপ্তকে শুধুই হাসি-খুশি রসিক মানুষ ভাবত।

কিন্তু এই দিনে প্রতিবারই সে সমর গাঙ্গুলিকে প্রণাম করতে যায় একবার। আজ যাবে কি যাবে না? এই একজনেরই আশীর্বাদের প্রতি লোভ আছে। কিন্তু আবার যেখানে একটা জটিল পদক্ষেপের সূচনা দেখা যাচ্ছে, এই লোকের সামনে গিয়ে দাঁড়ানো সহজ নয়।

তবু না গিয়ে পারা গেল না। ভাগ্যি এসেছিল। ওকে দেখেই হাতের বই নামিয়ে সমর গাঙ্গুলি হাসি মুখে বললেন, এসো, আজ তুমি আসবে জানতাম। আশ্চর্য, এই দিনটা ইনিও মনে করে বসে আছেন। পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে উনি মাথায় হাত রাখলেন। এটা বড় করেন না। মীনার ভিতরের অস্বস্তি নড়াচড়া খেল এক প্রস্থ। এ-সব লোকের সামনে সাদা মন নিয়ে না আসতে পারার বিড়ম্বনা কম নয়।

সমর গাঙ্গুলি বললেন, বউমার মুখে শুনলাম শিগগীর ছুটি নিয়ে বাইরে যাচ্ছ কোথায়?

বউমা অর্থাৎ কমল গাঙ্গুলির বউ। ঢোক গিলে মীনা জবাব দিল, হ্যাঁ।

বেড়াতে?

হ্যাঁ....।

কোথায়?

এখনো ঠিক করিনি।

সমর গাঙ্গুলি বললেন, একঘেয়ে এক জায়গায় ভালো লাগার কথা নয়।....যেখানেই যাও সাবধানে থেকো, দিন কাল ভালো না।

মীনা মাথা নাড়ল, আর একটু বাদে পালিয়ে বাঁচল। ওর বাবা আছে, কিন্তু শুধু বাইরে নয়, নানা কারণে ভিতরটাও পঙ্গু তার। ফলে বাবার স্নেহের স্বাদ তেমন করে অনুভব করার সুযোগ মেলেনি। এ ভদ্রলোকের যেন বুক-ভরা সেই স্নেহ ওর জন্য।

বাইরে যাবার প্রসঙ্গে মীনা সত্যিকারের বিপাকে পড়েছিল। কোথায় যাবে কবে যাবে কেন যাবে তার কিছুই জানে না এখনো। অথচ আগে ভাগে যাওয়ার ব্যাপারটা বউয়ের মারফৎ এ-ভদ্রলোকের কানে তোলা হয়েছে কেন?...চক্রান্ত যদি কিছু থেকেই থাকে, বউকেও তার মধ্যে টানবে কমল গাঙ্গুলি—মনে হয় না। হয়তো ব্যাপারটা যাতে সহজ স্বাভাবিক মনে হয় সেই উদ্দেশ্যে বলে রাখা।

সেখান থেকে সোজা বীরেন গুপ্তর বাড়ি। ওরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই

সাদর অভ্যর্থনা জানালো তাকে।···আশ্চর্য, ওর খাতিরে বীরেন গুপ্তর পর্যন্ত আজ আপিস কামাই। হেসে বলল, পাতানো শালী নিজের শালীর থেকেও মিষ্টি, তার জন্মদিন চাট্টিখানি কথা নাকি।

হৈ-চৈ-এর মধ্য দিয়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে ওকে সঙ্গে করে বীরেন গুপ্ত একটু তাড়াতাড়িই বেরিয়ে পড়ল। ট্রেনে যাবে, কারণ কমল গাঙ্গুলি নিজের গাড়িতে গেছে। কাল ভোরে সেই গাড়িতে তিনজনে কলকাতা ফিরবে।

তুজনের একটা ফার্স্ট ক্লাস ক্যুপেই জুটল। গাড়ি ছাড়তে বীরেন গুপ্ত হেসে হেসে বলল, আনন্দ করতেই যাচ্ছি বটে, কিন্তু তোমাকে টেনে নিয়ে যাওয়ার পিছনে কমলের ছোটখাট কিছু উদ্দেশ্যও আছে। বুঝেছ বোধহয়?

হাল্কা রসিকতার সুরেই মীনা ফিরে জিজ্ঞাসা করল, ছোট-খাট?

বীরেন গুপ্ত হেসেই স্বীকার করল, তা অবশ্য নয়, তবে কমল বলছিল তোমাকে সে যতটুকু জেনেছে, তোমার কাছে এ জল-ভাত ব্যাপার।

ভনিতা বাদ দিয়ে মীনাই তাগিদ দিল, ব্যাপারটা বলুন তাহলে শুনি—নিজেকে একটু প্রস্তুত করে নিই।

তার আগে একটু কাজ সেরে নিই। নিজের পোর্টফোলিও ব্যাগ খুলে একটা চেক বার করে বীরেন গুপ্ত তার সামনে ধরল।—কমল তোমাকে আসানসোলে ডাকবে আগে ভাবেনি, তোমার জন্মদিনে এটা তোমাকে দেবার জন্যে আমার কাছে রেখে গেছিল। পরে বাড়ি ফিরে ফোনে তোমাকে আসানসোলে টেনে নেবার কথা বলেছে।

সই করা চেকটা হাতে নিয়ে দেখল মীনা। দশ হাজার টাকার চেক। বীরেন গুপ্তর চোখে চোখ রেখে হাসল একটু।—ছোট-খাট ব্যাপারই মনে হচ্ছে···

মাথা নেড়ে একই সুরে বীরেন গুপ্ত জবাব দিল, দশ হাজারের মতো ছোট নয় তা বলে···ওদিক ভাবলে কম করে আরো যাট-সত্তর হাজার পাওনা হবে তোমার।

মীনার হঠাৎ জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করল, আপনার কত পাওনা হবে? কিন্তু জিজ্ঞাসা করার মতো অত বোকা নয় সে। শুধু এটুকুই স্পষ্ট, যে ব্যাপারই হোক, বীরেন গুপ্তও তার থেকে বিচ্ছিন্ন নয়।

চেকটা নিজের ব্যাগে রাখল।—ভয় ধরিয়ে দিলেন। এবার বলুন শুনি—

আসল শোনার যেটুকু কমলই বলবে। আমার শুধু ওদের পারিবারিক ব্যাপারটার সম্পর্কে তোমাকে একটু ওয়াকিবহাল করে রাখার কথা।

মীনা অবাক একটু।—পারিবারিক বলতে ওঁর নিজের পরিবার ছাড়া আর কে আছে?

সমর গাঙ্গুলি আছেন।

মীনা রীতিমত থমকে তাকাল।—তিনি আঘাত পাবেন এমন কিছু করতে হবে নাকি আমাকে?

আঘাত পাবেন না এ-কথা বলি কি করে?

মীনা হঠাৎ জোর দিয়েই বলে ফেলল, তাহলে আমার পক্ষে একটু অসুবিধে হবে। তারপর কাতর সুরে বলল, ভালো মেয়ে নই, কিন্তু জগতে আমি এই একজনকেই ভক্তি করি, শ্রদ্ধা করি।....উনি আমার কত করেছেন আপনারা জানেন না।

একেবারে জানি না বলতে পারো না...যাক, সে ফয়সলা কমলের সঙ্গে কোরো। তবে, এর মধ্যে আর একজন আছে...রজত গাঙ্গুলির নাম শুনেছ?

না তো....কে?

কমলের দাদা। নিজের নয় অবশ্য, বৈমাত্রেয় ভাই। দু' বছরের বড় ওর থেকে, আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল।

ছিল?

হ্যাঁ, এখন ছিলই বলতে হবে।

আমার কাজ বোধহয় তাঁর সঙ্গে?

হ্যাঁ।

তাতে সমর গাঙ্গুলি আঘাত পাবেন কেন?

তার কারণ সমর গাঙ্গুলি এখন একটা বড় দায় মুক্ত হবার জন্যে ব্যস্ত। তোমার চেষ্টায় সেটার একটু রকমফের হতে পারে। একমাত্র যাকে সব থেকে বেশি ভালবাসেন তিনি তারই প্রতি হয়তো তাকে সব থেকে বেশি নির্মম হতে হবে।

ভালবাসেন রজত গাঙ্গুলিকে?

ভালবাসেন বললে সবটা বলা হবে না, সে তার বুকের কাছের একমাত্র একজন।···মাঝে মাঝে যে বেরিয়ে পড়েন, রজতের ওখানেই যান।

রজত গাঙ্গুলি থাকেন কোথায়?

দেরাদুনে। সেখানে তার নিজের একখানি বাড়ি আছে—মামা-বাড়ির দিক থেকে পাওয়া। তবে শিকারের মরশুম এলে কখন কোথায় থাকে বলা যায় না। তার বড় নেশা দুটো—এক শিকার, দুই ফুল আর গাছ-গাছড়া।

মীনা জিজ্ঞাসা করল, এ ছাড়া ছোট নেশাও কিছু আছে?

মুচকি হেসে বীরেন গুপ্ত জবাব দিল, অন্তত ছিল জানি, সমর কাকা এতদিনের চেষ্টায় একটুও শোধরাতে পেরেছেন কিনা বলতে পারব না।

মীনা গুম হয়ে বসে রইল একটু। কেন যেন চেকটা তার কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে। রজত গাঙ্গুলি চুলোয় যাক, কিন্তু সমর গাঙ্গুলির সঙ্গেই প্রকারান্তরে বিশ্বাসঘাতকতা করতে হবে বুঝে ভিতরটা ভয়ানক মুষড়ে গেল তার।

হঠাৎ সানুনয়ে বলল, ওই ভদ্রলোক আঘাত পান এমন কিছুর মধ্যে আমার যেতে ইচ্ছে করছে না—আপনি এ-ব্যাপার থেকে আমাকে তফাতে রাখার চেষ্টা করতে পারেন না?

বীরেন গুপ্ত আবারও হেসেই বলল, কমলেশ মুখে সব শোনার পর হয়তো বা এত খারাপ লাগবে না তোমার, আগেই এত উতলা হবার

কি আছে। কমল আর যা-ই হোক তার কাকার সঙ্গে শত্রুতা চায় না, উল্টে তাঁর প্রিয়পাত্রই হতে চায়।

তবু খানিক গুম হয়ে থেকে মীনা জিজ্ঞাসা করল, ওঁদের পারিবারিক ব্যাপারের কথা কি বলছিলেন ?

শুনল। আর এই থেকেই কমল গাঙ্গুলির উদ্দেশ্য কিছুটা আঁচ করা গেল।

…গাঙ্গুলিদের বিশাল বিত্তের মূলে যে মানুষটি তাঁর নাম সুরেশ গাঙ্গুলি। তিন যুগ ধরে এক্সপোর্ট ইমপোর্ট-এর ব্যবসা করে ভদ্রলোক যে টাকা করেছেন, পরের তিন পুরুষ আমিরী চালে বসে খেলেও সেটা ফুরোবার কথা নয়। কিন্তু আশ্চর্য রকম গোঁড়া আর সাত্ত্বিক মানুষ এই সুরেশ গাঙ্গুলি। ত্রি-সন্ধ্যা আহ্নিক বা জপ-তপ না করে জলস্পর্শ করতেন না। অঢেল বিত্তশালীদের এ-রকম বিপরীত রীতি বড় দেখা যায় না। আর তেমনি কড়া মেজাজ ছিল ভদ্রলোকের। তাঁর ইচ্ছে বা হুকুমের এতটুকু নড়চড় হলে সেটা বরদাস্ত করতে পারতেন না।

তাঁর দুই ছেলে। বড় সনৎ গাঙ্গুলি। ছোট সমর গাঙ্গুলি। বড় ছেলে গোড়া থেকে বাপের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিল। আর মেজাজী বাপের বাধ্যও ছিল বরাবর। সময় কালে বিয়ে দেওয়া হল তার। একটি ছেলে হওয়ার দেড় মাসের মধ্যে সেই স্ত্রী গত হলেন। সেই ছেলে রজত গাঙ্গুলি। তার মামা বাড়ির অবস্থা ভালো ছিল। দেড় মাসের সেই শিশুকে তার দিদিমা নিয়ে যান। পনেরো ষোল বছর পর্যন্ত রজত গাঙ্গুলি দিদিমার কাছে মানুষ হয়েছে। ঠাকুরদা সুরেশ গাঙ্গুলির মতে অমানুষ হয়েছে।

প্রথম স্ত্রী বিয়োগের ছ'মাসের মধ্যে সনৎ গাঙ্গুলি বাপের হুকুমে দ্বিতীয় স্ত্রী ঘরে আনেন। বছর ঘুরতে এই স্ত্রীরও ছেলেই হল।

এই ছেলে কমল গাঙ্গুলি। সনৎ গাঙ্গুলির বরাতে স্ত্রীটি বছর পনেরো ষোল বেঁচে ছিলেন। কিন্তু আর ছেলেপুলে হয়নি। দ্বিতীয় বার গৃহিণী শূন্য হবার পর সনৎ গাঙ্গুলির জীবনে আর তৃতীয়ার পদার্পণ ঘটেনি। সুরেশ গাঙ্গুলি সে-রকম হুকুম আর করেননি। কারণ বড় ছেলের বয়েস তখন চল্লিশের ওধারে। উল্টে ছেলেকে তিনি পরামর্শ দিয়েছেন, কাজকর্মের সঙ্গে সঙ্গে এবার ধর্মে কর্মে মন দাও।

কিন্তু সনৎ গাঙ্গুলির কাজ বা ধর্ম কর্ম কোনটাতেই মন দেবার মতো ফুরসৎ মেলেনি। পাঁচটা বছর না যেতে হঠাৎই চোখ বুজলেন তিনি। সুরেশ গাঙ্গুলির এটা কোন রকম হিসেবের মধ্যে ছিল না। তাঁর এত টাকা, মনের মতো ছেলের একটু চিকিৎসা করারও সুযোগ পেলেন না।

বড় ছেলেকে নিয়ে সুরেশ গাঙ্গুলির কোনদিন কোন রকম সমস্যা ছিল না। কিন্তু ভদ্রলোক সমস্যায় জর্জর ছোট ছেলে সমর গাঙ্গুলিকে নিয়ে। তার স্বভাব আর আচরণ বাপের বিপরীত একেবারে। অথচ, বড় ছেলে বাপের যত অনুগত আর যত বাধ্যই হোক, ভদ্রলোকের এই ছোট ছেলের প্রতিই একটা অন্ধ আকর্ষণ ছিল যেন। ফলে এই ছেলের আচরণ তাঁকে ক্রুদ্ধ ক্ষিপ্ত করে তুলত এক-এক সময়। সব রকম গোঁড়ামি আর রক্ষণশীলতার যেন মূর্তিমান প্রতিবাদ এই ছেলেটা। বাপ শাসন করতে এলে একটি কথাও বলত না। সামনে চুপ করে থাকত। আড়ালে হাসত। আর ঠিক নিজের বিবেচনার রাস্তা ধরেই চলত।

তখনো বড় রকমের সংঘাতের কারণ কিছু ঘটেনি। স্কুলে কলেজে বরাবর প্রথম হয়ে এসেছে ছেলে। ফলে ইচ্ছে থাকলেও বাপ তাকে নিজের ব্যবসার মধ্যে টেনে আনতে পারেননি। ভালো ভাবে এম. এ পাশ করে বেরুনোর পর আশা করলেন, ছেলে এবার কাজে কর্মে মন দেবে। সে-রকম কোন লক্ষণ দেখলেন না। ছেলে জানাল, বিলেত থেকে তার চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট হয়ে আসার ইচ্ছে।

ইচ্ছেটা সুরেশ গাঙ্গুলি প্রথম বিবেচনায় একেবারেই বাতিল করে

দিয়েছিলেন। কিন্তু এই সময় থেকেই তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠার মতোই কিছু খবর কানে আসতে লাগল তাঁর। সে খবর কোন মেয়েকে নিয়ে। ছেলের এত বড় দুঃসাহস হতে পারে তিনি কল্পনাও করতে পারেন না। প্রথমে বিশ্বাসও করেননি। কিন্তু নিজের গাড়িতে যেতে যেতে একটি মেয়ের সঙ্গে ছেলেকে নিজেই হাওয়া খেয়ে বেড়াতে দেখলেন তিনি। ছেলের স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে রীতিমত সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলেন। গোপনে সেই মেয়ের খোঁজ নিয়ে রাগে আরো দিশেহারা। বংশের মান মর্যাদা পর্যন্ত এ ছেলের কাছে কিছু নয়, এ তিনি ভাবতে পারেন না।

কিন্তু মানুষটা বুদ্ধিমান। মাথা খাটিয়ে সমস্যার সমাধান করতে চাইলেন। ছেলেকে ডেকে বললেন, তুমি চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেণ্ট হয়ে আসতে চাও আমার আপত্তি নেই, ব্যবসার সুবিধেই হবে তাতে। হিসেব নিকেশের সমস্ত ভার তোমার হাতে থাকলে তোমার দাদারও সুবিধে হবে। কিন্তু যাবার আগে বিয়েটা করে যেতে হবে।

সমর গাঙ্গুলি বাপের মুখের ওপর স্পষ্ট বিনীত জবাব দিলেন, সেটা সম্ভব নয়। এমন অবাধ্যতার কথা কানে শুনতেও অভ্যস্ত নন সুরেশ গাঙ্গুলি। তবু সংযত করলেন নিজেকে।—সম্ভব নয় কেন?

সমর গাঙ্গুলি জবাব দিলেন, এ নিয়ে এখন আমি মাথা ঘামাচ্ছি না। বাইরে থেকে ফিরে এসে ভাবব...।

তীব্র শ্লেষে ফেটে পড়তে চাইলেন সুরেশ গাঙ্গুলি।—ও! এটা তোমার মাথা ঘামানোর ব্যাপার? তুমি ভাববে?

এ ব্যাপারে অন্তত আমাকে ভাবার স্বাধীনতা দেবেন আশা করছি।

সহের সীমা ছাড়াচ্ছে সুরেশ গাঙ্গুলির। তবু ঠাণ্ডা, কঠিন। বললেন, তোমার যা মতিগতি, যদি শুনি সেখানে তুমি একটি ডানা-কাটা পরী জুটিয়ে বসে আছ—সেই স্বাধীনতাও তোমাকে দেব আশা করছ?

সমর গাঙ্গুলি বললেন, এখন পর্যন্ত সে-রকম ইচ্ছে নেই।...কিন্তু হলেও বিয়েটা ব্যক্তিগত রুচি আর পছন্দের ব্যাপার।

ও। এতে জাত-ধর্মের কোন বালাই নেই?

সমর গাঙ্গুলি সবিনয়েই জবাব দিলেন, আপনি যে জাত-ধর্মে বিশ্বাস করেন আমার তাতে বিশ্বাস নেই।

এবারে চারখানা হয়ে ফেটে পড়লেন সুরেশ গাঙ্গুলি। বললেন, খুব ভালো কথা, তুমি বিরাট বিদ্বান আর বুদ্ধিমান হয়েছ বুঝতে পারছি। কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে আমার এই জাত-ধর্মের ওপর এতটুকু ছায়া পড়লে সেটা বরদাস্ত হবে না এটা তুমি খুব ভালো করে জেনে রেখো। সে-রকম হলে তখন যেন বাপ বলে সম্পর্কটার ওপর খুব একটা বিশ্বাস রেখো না। এটুকু ভালো করে বুঝে নিয়ে রওনা হবার ব্যবস্থা কর।

ছোট ভাইকে সনৎ গাঙ্গুলি কম ভালোবাসতেন না। বাপের মুখের ওপর ভাইয়ের এত কথা শুনে ভয়ে কেঁপেছেন তিনি। পরে ভাইকে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন, বাবার অবাধ্য হোস না, যা বলছেন শোন—।

হেসে সমর গাঙ্গুলি ফিরে দাদাকে বলেছেন, বাবা তো কত কি দেখে কত ভাবে ঠিকুজি মিলিয়ে প্রথম বার বিয়ে দিয়েছিলেন তোমার—তার কি হল?

মাত্র এক বছরের পরমায়ু নিয়ে এলেও সেই বউদিটিকে যথার্থ ভালোবেসে ছিলেন সমর গাঙ্গুলি। বেকায়দায় পড়ে সনৎ গাঙ্গুলি জবাব দিয়েছেন, ভবিতব্যের ওপর কারো তো কোন হাত নেই।

সমর গাঙ্গুলি বলেছেন, আমার ভবিষ্যতটাও তাহলে তোমরা ভবিতব্য বলেই মেনে নাও।

সমর গাঙ্গুলি বিলেত চলে গেলেন। তিন বছর না চার বছর বাদে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট হয়ে ফিরলেন। কিন্তু আশ্চর্য, তার পরেও ক'টা বছরের মধ্যে বিয়ের ব্যাপারে কান পাতলেন না। দাদা বকাবকি করতে লাগলেন। বাবার ধারণা হল, এ ছেলে বাইরেই কিছু গণ্ডগোল পাকিয়ে বসে আছে। ক্রমশ নির্মম কঠিন হয়ে উঠতে লাগলেন তিনি।

একটু চিন্তা করে বীরেন গুপ্ত আবার বলে গেল, এরও কয়েক বছর বাদে হঠাৎ সত্যি এক স্ত্রীলোক-ঘটিত ব্যাপারেই বাপের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল তাঁর। সুরেশ গাঙ্গুলি ত্যজ্যপুত্র করলেন তাঁকে। সমর গাঙ্গুলি আগের মতই একরোখা, বেপরোয়া। বাপকে মুখের ওপর বলে দিলেন, অন্যায় কিছু করিনি। আমার বিবেক যা বলেছে তাই করেছি। আপনার বিষয়-আশয়ের প্রতি আমার কানাকড়িও লোভ নেই।

....তারপর বহু বছর কেটে গেছে। স্বাধীন ব্যবসায় সমর গাঙ্গুলিও জীবনে কম উপার্জন করেননি। এদিকে সম্পর্ক তখন তিনি শুধু বড় ভাইয়ের প্রথম পক্ষের ছেলে রজতের সঙ্গেই রেখেছেন। ফাঁক পেলে তার কাছে যান, তাকে নিজের কাছে নিয়ে আসেন। দাদু সুরেশ গাঙ্গুলি কেন যেন রজতের ওই মামা বাড়ির আশ্রয়টাকে ভালো চোখে দেখতেন না। আর আদব কায়দা দেখে নাতি অমানুষ হচ্ছে ভাবতেন। বড় ছেলে মারা যাবার পরেও শক্ত হাতে আর শক্ত মেজাজে নিজের ব্যবসা আর কাজকর্মের হাল ছিলেন তিনি।

....বছর চোদ্দ পনেরো বাদে ছোট্ট ছেলে সমর গাঙ্গুলির সঙ্গে সেই অবাঞ্ছিত স্ত্রীলোকটির সমস্ত সম্পর্ক বরাবরকার মতো ঘুচে গেছে জানার পরে ভিতরটা আস্তে আস্তে নরম হয়ে আসতে লাগল তাঁর। আর বছর দুই বাদে ছোট ছেলেকে কাছে ডাকলেন। বললেন, মাত বদলালে তিনি তাঁকে ক্ষমা করতে রাজি আছেন।

ছেলে হেসেই জবাব দিলেন, সাতচল্লিশ বছর বয়সে আর মতি বদলানো সম্ভব নয়। তাছাড়া আগেও তিনি ক্ষমার অযোগ্য কোন কাজ করেছেন ভাবেন না। বাবা তাঁকে আবার ডেকেছেন ভালো কথা, কিন্তু সম্পত্তির অংশ নিতে তিনি অপারগ। বললেন, যা আছে আপনার দুই নাতিকেই দিয়ে যাবেন।

এর কিছুদিন বাদে সুরেশ গাঙ্গুলি অসুস্থ হয়ে পড়তে ছোট ছেলেকে তাঁর কাছে এসে থাকতেও হল। কিন্তু বাপের বিষয়ের ওপর তাঁর বিন্দুমাত্র লোভ নেই।

ছোট ছেলের জন্যে বাপের মন দুর্বল হলেও ভিতরে চাপা ক্ষত একটা থেকেই গেছল। তার ওপর ডবল আঁচড় পড়তে থাকল, বড় নাতি রজত গাঙ্গুলির স্বভাব চরিত্রের খবর কানে আসতে। দুই নাতির ওপরেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন তিনি। বাপ দাদার ব্যবসার দিকে এক নাতিও ফিরেও তাকায় না। নিজের ছোট ছেলে তো তাকাবেই না। শেষে নিরুপায় হয়ে সমর গাঙ্গুলি আর বীরেন গুপ্তর বাবার পরামর্শেই এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের ব্যবসা মোটা টাকার বিনিময়ে অপরের হাতে তুলে দিলেন। কাঁচা টাকা আর নানা জায়গায় জমি আর বাড়ি ঘর সমেত মোট যে বিত্ত হাতে আছে তারও বিলি ব্যবস্থা করে উঠতে পারছেন না।

না পারার কারণ বড় নাতি রজত গাঙ্গুলি।

শিকার দু'চক্ষের বিষ বুড়োর। তাঁর বিবেচনায় এটা অধর্ম। তার ওপর যখন কানে এলো সে মদ-টদও খায়, তখন ক্রোধে দিশেহারা হয়ে পড়লেন তিনি। শেষে শুনলেন, এখানেই শেষ নয়, নানা জাতের মেয়ে নিয়েও অনেকেই ঘোরাফেরা করতে দেখেছে তাকে। সুরেশ গাঙ্গুলি গোপনে লোক লাগালেন তার পিছনে। কিন্তু না, কোন খবরই মিথ্যে নয়।

শেষ বয়সে আর একবার গর্জে উঠলেন তিনি। বড় নাতিকে শাসিয়ে চিঠি লিখলেন। রজত গাঙ্গুলি পাল্টা জবাব পাঠালো—দাদু, তোমার কাজ আর তোমার জপতপ নিয়ে তুমি থাক—আমাদের ব্যাপারে মাথা গলাতে এলে দুঃখ পাওয়া ছাড়া আর কিছু লাভ হবে না।

এবারে স্থির চিত্তে আর একটি নির্মম উইল করলেন সুরেশ গাঙ্গুলি। তাঁর সমস্ত টাকাকড়ি বিষয়-আশয় দুই নাতিই পাবে। কিন্তু পাবে কতগুলো বিশেষ শর্ত সাপেক্ষে। সমস্ত ভাণ্ডারের ট্রাস্টি করে দিয়ে গেলেন ছোট ছেলে সমর গাঙ্গুলিকে। চুল চিরে সেই সব সর্ত বিবেচনা করে সময় হলে দুই নাতিকে সম্পত্তি ভাগ করে দেবেন কাকা সমর গাঙ্গুলি। শর্ত পালন না করলে এক নাতিও

কিছু পাবে না—সমর গাঙ্গুলির বিবেচনা মত সব তখন কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠানে চলে যাবে। দুই নাতির একজন শর্ত অমান্য করলে অপরজন সমস্তটা পাবে।

এ রকম কঠিন দায়িত্ব সমর গাঙ্গুলি নিতে চাননি। কিন্তু সুরেশ গাঙ্গুলি বলেছেন, এ তোমার বাবার শেষ আদেশ বলে ধরে নিতে পারো।—এ আদেশ তুমি অমান্য করবে?

অমান্য করেননি।

... পাঁচ বছর আগে সুরেশ গাঙ্গুলি মারা গেছেন। কমল গাঙ্গুলি আজ পর্যন্ত তার দাদুর কোন শর্ত লঙ্ঘন করেনি। তার প্রাপ্য টাকা আর সম্পত্তির আট আনা অংশের মধ্যে ছ'আনা তাকে দিয়েই দিয়েছেন সমর গাঙ্গুলি। বাকি দু'আনাও দেবার জন্যে ঝকাঝকি করছেন তিনি। কমলই গা করছে না, বলছে, হবে'খন, অত ব্যস্ত হবার কি আছে।

কিন্তু ভদ্রলোক বিপাকে পড়েছেন রজতের আট আনা অংশ নিয়ে। রজত তাঁর যতই বুকের কাছের একজন হোক, পিতৃআজ্ঞা নাকচ করার মানুষ নন্ তিনি। রজত গাঙ্গুলি তার দাদুর শর্ত পালন করছে এটা তিনি চোখ-কান বুজে স্বীকার করতে পারছেন না। অথচ এই গুরুভারও আর তিনি বইতে চাইছেন না।

বীরেন গুপ্ত থামতে মীনা জিজ্ঞাসা করল, উইলের শর্তগুলি কি ছিল?

বুঝতেই তো পারছ, কতগুলো নীতি আর আচরণের ব্যাপার। কমল তোমায় বলবে 'খন।

একটু চুপ করে থেকে মীনা আবার জিজ্ঞাসা করল, গাঙ্গুলিদের সেই আগের দিনের ঘরের খবর আপনি এতটা জানলেন কি করে?

আমার বাবা ওই সুরেশ গাঙ্গুলির কাছেই মানুষ। ছেলের

মতো দেখতেন তাঁকেও। অ্যাটর্নীশিপ পাশ করিয়ে তিনিই তাঁকে এই দপ্তর করে দিয়েছিলেন। সুরেশ গাঙ্গুলির ব্যবসার আইনগত যাবতীয় ব্যাপার বাবাই দেখতেন।

এত সহজে ওই অ্যাটর্নী আপিসে মীনার চাকরি কি করে হয়েছিল এখন বুঝতে পারছে। কিন্তু কৃতজ্ঞতার বোঝা এই লোক এখন আর বইতে রাজি নয় নিশ্চয়। নইলে কমল গাঙ্গুলি এভাবে তাকে হাত করে কি করে। টাকায় অনেক কিছু সম্ভব হয়।

মনোভাব প্রকাশ না করে জিজ্ঞাসা করল, রজত গাঙ্গুলিকেও আপনি অনেক কাল জানেন তাহলে?

বীরেন গুপ্ত হাসতে লাগল।—বললাম তো, সে-ই আমার বন্ধু ছিল।—পনেরো ষোল বছর পর্যন্ত রজত বেশির ভাগ সময় মামা বাড়িতে কাটিয়েছে। কিন্তু তখনো সুরেশ গাঙ্গুলি মাঝে মাঝে নিয়ে আসতেন তাকে। ন'দশ বছর বয়েস থেকে আমাদের বন্ধুত্ব বলতে পারো। রজত চলে গেলে আমি হাঁ করে থাকতাম কবে আবার আসবে। পনেরো ষোল থেকে বাইশ তেইশ বছর বয়েস পর্যন্ত এখানে দাদুর কাছেই থেকেছে সে। তখন একসঙ্গেই স্কুল-কলেজে পড়েছি আমরা। তারপর দাদুর সঙ্গে বনিবনা না হওয়াতে আবার পালিয়েছে সে। সেই থেকেই এক রকম কলকাতা ছাড়া বলতে পারো।··· কমলের প্রতি দাদুর পক্ষপাতিত্বটা সব থেকে বেশি অসহ্য ছিল ওর। আগে তো ফাঁক পেলে মারধরই করত কমলকে। অবশ্য কমলও ওর পিছনে কম লাগত না। ওর সিগারেট খাওয়ার ব্যাপারগুলো সব কমলই সবার আগে দাদুর কাছে ফাঁস করেছে।

কি ভেবে মীনা জিজ্ঞাসা করল, আপনার সঙ্গে তাহলে রজত গাঙ্গুলির এখন আর যোগাযোগ নেই?

নেই কি! তার কাকাকে বাদ দিলে একমাত্র আমার সঙ্গেই তার যোগাযোগ আছে। গেল বছরেও তো সপরিবারে ওর দেরাদুনের বাড়িতে এক মাস কাটিয়ে এসেছি।

বন্ধুত্ব বটে! শ্লেষের অভিব্যক্তিটা প্রকাশ পেল না অবশ্য। মীনার

কাছে কমল গাঙ্গুলির এখন কোন্ ধরনের প্রত্যাশা সেটা সহজেই আঁচ করা যাচ্ছে। তার একমাত্র শত্রু রজত গাঙ্গুলি। দাদুর উইলের শর্ত থেকে তাকে সকলের বিশ্বাসযোগ্য ভাবে তফাতে রাখতে হবে। এই একটি মাত্র লক্ষ্যের দিকে চোখ রেখেই কমল গাঙ্গুলি দেড় বছর আগে ওকে নিজের প্রতিষ্ঠানে টেনেছে। তারপরেও স্নায়ুর জোর বোঝাবার জন্যে অনেক উদারতার ফাঁকে ওকে যাচাই করে নিয়েছে। আজ ওর ব্যাগে তার দেওয়া দশ হাজার টাকার চেক। কাজ শেষ হলে এর অনেকগুণ প্রাপ্তির কথাও বীরেন গুপ্ত শুনিয়ে রেখেছে।

মীনার আপত্তি ছিল না। পুরুষ শত্রু। সেই পুরুষ যত রসাতলে যায়, যত বেশি নরক দেখে তত আনন্দ তার।

... শুধু সব কিছুর সঙ্গে ওই একটি মানুষের সংশ্রব না থাকলে আনন্দে ওর সমস্ত স্নায়ু তীক্ষ্ণ সজাগ হয়ে উঠতে পারত। ওই সময় গাঙ্গুলির সঙ্গে থেকে থেকে কেমন মনে হচ্ছে, ভদ্রলোক যেন অপার বিস্ময় আর বেদনা নিয়ে এখনই তার দিকে চেয়ে আছেন।

আসানসোলের সব থেকে সেরা হোটেলেই এক রাতের জন্যে দু'খানা সুইট ভাড়া করা হয়েছিল। একটা মীনার, অন্যটা বীরেন গুপ্ত আর কমল গাঙ্গুলির।

দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কমল গাঙ্গুলি সানন্দে শুভেচ্ছা জানাল মীনাকে। প্রত্যেক জন্মদিনে মীনার বয়স একটু করে কমছে পলকা উচ্ছ্বাসে সেই ঠাট্টাও করল। হাসি খুশির মধ্যে এক দফা চায়ের পর্ব শেষ হতে মীনাকে স্নান সেরে নিতে বলে বীরেন গুপ্তকে নিয়ে সে পাশের সুইটে এলো। সমস্ত দিনের খাটা খাটুনির পরে সে নিজেও নাকি পরিশ্রান্ত খুব।

মীনার অনারেই সন্ধ্যের শো-তে ইংরেজি সিনেমা দেখা হল একটা। তারপর হোটেলে ফিরে খাওয়া দাওয়ার পর্ব। ভালো

আয়োজনই করে রেখেছিল কমল গাঙ্গুলি। এও আনন্দের মধ্যেই সমাধা হয়ে গেল। যেন একজনের জন্মদিন উপলক্ষ্যে নিছক আনন্দ করতেই আসা।

খাওয়া দাওয়া চলছিল কমল গাঙ্গুলির স্যুইটে বসে। শেষের মাথায় হাসিমুখে আলতো করেই জিজ্ঞাসা করল সে, মীনার নাকি ভয়ানক মন খারাপ শুনলাম?

মীনা জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকাল। প্রসঙ্গের অবতারণা এটা বুঝতে পারছে।

....বীরেনদার মুখে শুনলাম, যে ব্যাপারে তোমার সাহায্য আশা করছি, তার সঙ্গে আমার কাকার যোগ আছে শুনেই নাকি ভয়ানক মুষড়ে পড়েছ। আর শুধু কাকা আছেন জেনেই তুমি এ সবের মধ্যে থাকতেও চাইছ না।

কি জবাব দেবে মীনা ভেবে পেল না।

দরদের সুরে কমল গাঙ্গুলি আবার বলল, আমার কাকার প্রতি সত্যিই তোমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই—তাই না?

মীনা হাসতে চেষ্টা করল। বলল, আমি এমন মেয়ে যে সেটা আপনাদের বিশ্বাস করতে অসুবিধে হচ্ছে বুঝতে পারছি।

আইসক্রিম শেষ হবার আগেই বীরেন গুপ্ত একটা সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল। তেমনি সদয় মুখেই কমল গাঙ্গুলি বলে উঠল, না না, আমার বিশ্বাস করতে একটুও অসুবিধে হচ্ছে না। বরং তুমি বিশ্বাস করতে পারো, তোমার বিবেকে বাধলে আমি একটুও জোর করব না। আমি তো তোমাকে এখন পর্যন্ত কিছু বলিইনি, বীরেনদা যদি কিছু বলে থাকেন, তাও স্রেফ ভুলে যেতে বলব তোমাকে তাহলে।

এবার মীনা সচকিত একটু। এতখানি উদারতা প্রত্যাশার বাইরে। সত্যিই কমল গাঙ্গুলি ওর দিকে নরম চোখে চেয়ে চেয়ে হাসছে। চোখাচোখি হতে আবার বলল, ওই দশহাজার চেক ওজন্যেই আগে ভাগে দিয়ে রেখেছি তোমাকে। তা নয়। এই দেড় বছরে তুমি

কত উপকার করেছ আমার নিজেই জানো না।...যে কাজের কথা বলব ভেবেছিলাম সেটা হলে লাখ টাকা পুষিয়ে দিতেও আপত্তি ছিল না আমার, আর যদিও তাতে কাকাকে বঞ্চিত করার কোন প্রশ্নই ছিল না।....তবু না যদি হয় না-ই হবে, তোমার ফিলিংটা ছোট করে দেখব কেন। কি হল, আইসক্রিম ভালো হয়নি?

মীনা তাড়াতাড়ি জবাব দিল, হ্যাঁ, খুব ভালো হয়েছে।

বীরেন গুপ্ত ঘরের ছাদের দিকে চেয়ে সিগারেট টানছে।

না, এত সহজে সমস্যার নিষ্পত্তি হয়ে গেল মীনা ভাবতে পারছে না।

জল খেয়ে রুমালে মুখ মুছতে মুছতে ঈষৎ কৌতুকের সুরে কমল গাঙ্গুলি এবারে এক আশ্চর্য প্রসঙ্গ তুলল।—আচ্ছা মীনা, তোমার তখন বছর তের বয়েস হবে, তোমার বাবার চাকরি নেই, চারদিকে ধার-দেনায় তলিয়ে গেছেন—সেই অভাবের সময় তোমাদের চলত কি করে?

হঠাৎ এ প্রসঙ্গ তুলে কমল গাঙ্গুলি কি বলতে চায় মীনা ভেবে পেল না। জবাব দিল, মাসিমা সাহায্য করতেন।

মাসে কত টাকা সাহায্য করতেন?

আড়াইশো টাকা।

কিন্তু তোমার মেসো বেসরকারী কলেজের সামান্য মাইনের মাস্টার তখন, ভাড়াটে বাড়িতে থাকেন, নিজের তিনটে ছেলেপুলে—ফি মাসে আড়াইশো টাকা তিনি সাহায্য করতে পারেন কি করে, এমন কথা তোমার মনে এসেছে কখনো?

মীনা বিমূঢ় নেত্রে চেয়ে রইল শুধু। এই লোক এত জানল কি করে। যা বলছে, চিন্তা করলে একটু অবাক হবার মতোই বটে। মাসে আড়াইশো টাকা সাহায্য শুধু নয়, মাসি ভালো ভালো জামা কাপড় দিত ওকে, জন্মদিনে গয়না পর্যন্ত দিত, অথচ নিজের ছেলেদের জন্যে কখনো কিছু করত না।

কমল গাঙ্গুলি হেসে মাথা নাড়ল।—না, সে টাকা তোমার মাসি

দিত না। তখনো আমার এই কাকার এত স্নেহ তোমার ওপর যে এ টাকা তিনিই দিতেন। শুধু এই নয়, কাকা তোমার জন্যে আরো অনেক খরচ করতেন।…চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট মানুষ, হিসেব রাখাটা মজ্জাগত ব্যাপার। তাঁর সেই হিসেবের খাতার ফোটোস্ট্যাট কপি আমার কাছে এখানেই আছে, দেখবে ?

মীনা বিস্ফারিত চোখে চেয়েই আছে তার দিকে। বীরেন গুপ্তর দিকেও তাকালো। খাওয়া সিগারেট থেকে সে নতুন করে আর একটা সিগারেট ধরাচ্ছে।

হেসে হেসেই কমল গাঙ্গুলি আবার বলে গেল, তারপর দেখ, আমার কাকা সমর গাঙ্গুলির এত স্নেহ আর এত দরদ তোমার ওপর যে তুমি টাইপ আর শর্ট-হ্যাণ্ড পাশ করে বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গে তোমার মেসোর সঙ্গে কথা বলে বড় কোম্পানিতে ভালো মাইনের চাকরি করিয়ে দিলেন তোমার।…সেই কেবল্ ম্যানুফ্যাকচারিং ফার্মের ছোট সাহেব চঞ্চল রায়চৌধুরীর সঙ্গে পরে বন্ধুত্ব পাতিয়ে সবকিছু জেনে নিতে অসুবিধে হয়নি আমার। থার্ড ক্লাস লোফার একটা। তোমার সঙ্গে শুধু বিশ্বাসঘাতকতাই করেনি, মত্ত অবস্থায় তোমাকে চাবুক মারার কথা তোমার মেসো আর মাসির মুখে শুনে আমার কাকা সমর গাঙ্গুলি এত ক্ষেপে গেছলেন যে দ্বিতীয় দফা বিলেত যাওয়ার আগে টাকা খরচ করে লোক লাগিয়ে সে লোফারটাকে আধমরা করে হাসপাতালে পাঠিয়ে ছেড়েছেন। তোমার প্রতি আমার কাকার কত স্নেহ কত দরদ, সেটা অস্বীকার করার জো নেই সত্যি কথাই।

মীনা হতভম্বের মতো বলে উঠল, তিনি শাস্তি দিয়েছিলেন তাকে!

হ্যাঁ তিনি। আমি প্রমাণ পেয়ে বলছি।

মীনা নির্বাক, স্তব্ধ। এসব কি বলে যাচ্ছে লোকটা। কি বলতে চায়!

কমল গাঙ্গুলির তাড়া কিছু নেই। ধীরে সুস্থেই বলে চলেছে, বিলেত থেকে ফেরার পরেও তোমার প্রতি আমার কাকার স্নেহ মায়া

মমতার এতটুকু ঘাটতি ছিল না। তখন আবার তুমি খুব ভালো রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছ না। তিনি তোমাকে আবার ডেকে বীরেনদার আপিসে ভালো চাকরি দিয়ে বসিয়ে দিলেন। তুমি সবটা জানো আর না-ই জানো, এতখানি উপকার যিনি করেছেন তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকাটা আমি একটুও অস্বাভাবিক মনে করি না।

বীরেন গুপ্ত নিস্পৃহ মুখে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়েই চলেছে। স্থান-কাল ভুলে মীনা কমল গাঙ্গুলির মুখের দিকে চেয়ে আছে। কি মতলবে এই লোক তার কাকার সম্পর্কে এত বলছে, এত প্রশংসা করে চলেছে কিছুই মাথায় ঢুকছে না। অথচ বুকের তলায় কি এক অজ্ঞাত আশংকার ছায়া পড়ছে যেন।

নড়ে চড়ে একটু সোজা হয়ে বসল কমল গাঙ্গুলি। এবারের হাসিটা ধারালো। —কি মীনা, আমি যদি বলি আমার কাকা সমর গাঙ্গুলির তোমার প্রতি এত স্নেহ এত মায়া এত দরদের কিছুই নিখাদ সত্যি নয়—তিনি শুধু তাঁর নিজের পাপের আর তোমার উপর তাঁর অবিচারের প্রায়শ্চিত্ত করে চলেছেন? খুব অবিশ্বাস হবে?

ঠিক সেই মুহূর্তে বদ্ধ চেতনার দরজায় প্রচণ্ড আঘাত পড়ল একটা। মীনা ছিটকে উঠে দাঁড়াল। তীব্র তীক্ষ্ণ স্বরে বলে উঠল, কি বলতে চান আপনি? আমার মা-কে—থেমে গেল। শরীরের সমস্ত রক্ত বুঝি মুখে উঠে এসেছে।

কমল গাঙ্গুলি জবাব দিল, আমি বলতে চাই না। এটাই একমাত্র সত্য। তোমার মা মায়া দত্ত প্রায় বারো বছর ঘর করেছেন তাঁর সঙ্গে। আর তাঁকে নিয়েই দাদুর সঙ্গে তাঁর এত বড় ঝগড়া। কাকা তোমাকে নিঃস্ব করেছেন, তোমার বাবাকে নিঃস্ব করেছেন। আর তারপর তোমার ওপর স্নেহ আর দরদ ঢেলে নিজের অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করছেন, ভাবছেন। যদি চাও কলকাতায় গিয়ে সমস্ত প্রমাণ আমি তোমাকে দিতে পারব। তাছাড়া, ঠাণ্ডা মাথায় একটু চিন্তা করলে তুমি নিজেই সব বুঝতে পারবে। চাও তো, সোজা তোমার মাসির কাছে গিয়ে তাঁকেও জিজ্ঞাসা করতে পারো।

তোমার মেসোর সঙ্গে আমার কাকার তেমন যোগাযোগ ছিল না—তোমার জন্যে তোমার মাসির সঙ্গে ছিল।

নিজের অগোচরেই মীনা বসে পড়ল আবার। না, অবিশ্বাস করার মতো কিছু নেই আর। যা শুনল তা-ই একমাত্র সত্যি হতে পারে। এই একমাত্র নির্মম নিষ্ঠুর সত্যি হতে পারে। শিরায় শিরায় আগুন জ্বলছে মীনার। মাথায় আগুন জ্বলছে। এ আগুনে সব কিছু জ্বালিয়ে দিতে পারে সে এখন। দেবে। দেবে দেবে দেবে। সমর গাঙ্গুলির ওই সাত্ত্বিক মুখোশ ছিঁড়েখুঁড়ে টেনে ফেলে তাঁর বুকে ছুরি বসাতেও দ্বিধা নেই আর। কমল গাঙ্গুলি ওর যত উপকার করেছে তেমন আর কেউ করেনি। সে ওর জীবনের সব থেকে বড় শত্রুকে চিনিয়ে দিয়েছে। তাঁকে চেনার পর আর ক্ষমার প্রশ্ন নেই। আজকের জন্মদিনটা সার্থক বটে।

ভোর রাতে আসানসোল থেকে রওনা হয়েছিল। সকাল সাড়ে আটটার মধ্যে কমল গাঙ্গুলির গাড়ি তাকে গলির দিকে নিয়ে এলো। হিংস্র আক্রোশে মীনার সমস্ত মুখ থমথমে লাল তখনো।

কিন্তু গাড়ি গলির দিকে এগোতে হঠাৎ ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল সে। সমস্ত গলি আর রাস্তা যেন উত্তেজনায় থম থম করছে। একটু দূরে এক একটা জটলা। সকলের চোখ তাদের গলির দিকে।

বিমূঢ় মুখে মীনা গাড়ি থেকে নামল। গলির ভিতরে পুলিশ ছেয়ে গেছে। মীনাকে দেখে কোথা থেকে বিল্টু ছুটে এলো। চাপা উত্তেজনায় দিদিমণিকে বলল, বলু ঘোষের ঘর সার্চ করছে ওরা—ভিতরে সকলের জায়গা হচ্ছে না বলে বাইরে ভিড় করেছে। হাত ধরে টানল, শিগ্‌গীর চলে এসো, এখানে দাঁড়িয়ে থেকো না।

ঘরে এসে যা শুনল, হঠাৎ পা থেকে মাথা পর্যন্ত কেঁপেই উঠল মীনার।—কাল সমস্ত রাত বাইরে কাটিয়ে ভোর রাতে ঘরে ফিরেছিল

বল্টু ঘোষ। কিন্তু বউ দরজা খুলছে না দেখে গলা ছেড়ে গালাগালি আর দরজার গায়ে দুমদাম লাথি। আধ ঘণ্টার চেষ্টায়ও যখন দরজা খোলানো গেল না তখন ও-ধারের খুপরি জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখে তিন ছেলেমেয়ে আর সীতা বউ মেঝেতে শুয়ে আছে।

এরপর লোকজন জড়ো হল। দরজা ভাঙা হল। তিনটে ছেলে মেয়ে আর সীতা বউ মরে পড়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে পাড়ার ডাক্তারও ছুটে এসেছে। সে বলেছে সীতা বউ আর বড় ছেলেমেয়ে দুটো বিষ খেয়েছে। কোলের ছেলেটাকে খুব সম্ভব গলা টিপে মারা হয়েছে। এক ঘণ্টা আগে সব ক'টা লাশ একটা গাড়ি এসে তুলে নিয়ে গেছে। ....বিল্টু জানে, কাল রাতে সীতা বউ ছেলেমেয়েদের নিয়ে খুব ভালো খাওয়া দাওয়া করেছে। দুপুর থেকে বিল্টু নিজেই ভালো ভালো রান্না করতে দেখেছে সীতা বউকে। সকলে বলাবলি করছে রাতে খাওয়া দাওয়ার সঙ্গে বড় ছেলে আর মেয়েকে বিষ খাইয়ে কোলেরটাকে গলা টিপে মেরে শেষে নিজেও বিষ খেয়ে মরেছে সীতা বউ। তারপর এই একঘণ্টা হয়ে গেল পুলিশের দঙ্গল এসে সার্চ শুরু করেছে। প্যাঁটরায় নাকি সীতা বউয়ের লেখা চিঠিও পেয়েছে একটা, তাতে সীতা বউ লিখেছে, সকলের মৃত্যুর জন্যে তার স্বামী বল্টু ঘোষ দায়ী। তার অত্যাচারেই বাঁচার সাধ ফুরিয়েছে সকলের।

পায়ের তলা থেকে যেন মাটি সরে যাচ্ছে মীনার। সীতা বউয়ের টাকা নিয়ে যাওয়ার অর্থ আর দুর্বোধ্য নয় একটুও। চমকে উঠল, প্রমথ কাকা এসে যাওয়ার দরুন কালকের সেই ছাবটা বাক্সেই থেকে গেছে।

বিল্টুকে বিদায় করে ছবি বার করল। রান্নার জায়গায় গিয়ে দেখল উনুন খাঁ খাঁ করে জ্বলছে। ছবিটা আগুনে ফেলে দিতে নিমেষে ছাই হয়ে গেল সেটা। উনুনটা তবু ভালো করে খুঁচিয়ে দিল মীনা।

নিজের ঘরে এসে বসল একটু। বুকের তলায় ধক্‌ধক্‌ করছে।.... ওর টাকাতেই গেল রাতে ভালো খেয়েছে সীতা বউ আর তার ছেলেমেয়েরা। বিষও হয়তো তার টাকাতেই সংগ্রহ হয়েছে। কি

বিষ, পোস্টমর্টেমের আগে জানা যাবে না। কিন্তু মীনার দায় কতটুকু? কিছু না। কিছু না। মুক্তির রাস্তা পেয়ে সীতা বউ হয়তো আশীর্বাদই করেছে তাকে।

দরজার বাইরে উঁকি দিল। বলু ঘোষকে হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওরা। হঠাৎ সেই হিংস্র আক্রোশে ভিতরটা খলখল করে উঠল মীনার। বেশ হয়েছে। চমৎকার হয়েছে। সীতা বউ তার ওপর অত্যাচারের জবাব দিতে পেরেছে।

মীনা পারবে না? এইরকম বড় করেই কিছু করতে পারবে না।
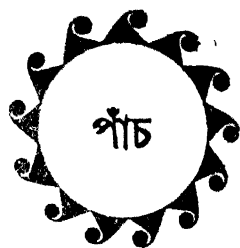
ট্রেন থেকে দেরাদুন স্টেশনে নামতেই ঝমঝম বৃষ্টি। নির্বুদ্ধিতার জন্যে মীনা নিজের ওপরেই বিরক্ত হল প্রথম। নতুন বর্ষা শুরু, কিন্তু সঙ্গে না এনেছে একটা ছাতা না একটা বর্ষাতে। অথচ জায়গাটার সম্পর্কে ওর যে মোটামুটি একটা ধারণা ছিল না এমন নয়। হোয়াইট্ টাওয়ারের কাজে কমল গাঙ্গুলির সঙ্গেই একবার মুসৌরি এসেছিল। তখন ক্ষণে ক্ষণে দেখেছে এই বৃষ্টি তো এই রোদ।

শেডের নিচ দিয়ে গেটের বাইরে আসার মধ্যেই অল্প-স্বল্প ভিজে গেল। প্রতি ব্যাপারে প্রথম সূচনার ওপর এক ধরনের মানসিক দুর্বলতা আছে মীনার। যার শুরু ভালো তার শেষ ভালো। দেরাদুনে এলো অথচ ছাতা-বর্ষাতি কিছু না আনার ভুলটা এখন আরো বিরক্তিকর লাগছে। আসলে গত কয়েকটা দিন ভিতরে ভিতরে একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনার মধ্যে কেটেছে। সেই কারণে ভুল।....
যতটুকু ভিজেছে, এ সবস্থায় সঙের মতো দাঁড়িয়ে থাকা বিড়ম্বনা।

অনেকেই ঘুরে ফিরে দেখছে ওকে। বয়েসকালের সুশ্রী সুডৌল মেয়েকে জলে ভিজতে দেখলে প্রায় পুরুষের চোখেই যেন দৃষ্টিভোজের উৎসব লাগে। এর আর স্নানকালের ব্যতিক্রম নেই খুব।

হঠাৎ মনে হল, যেখানে যার কাছে যাচ্ছে তার চোখ কতটা উৎসুক হতে পারে?

এ-রকম ভুলের সূচনাটা উল্টে শুভ নয় এ কে জোর দিয়ে বলতে পারে?

একটা ট্যাক্সি ডেকে উঠে বসল। তার মধ্যে আরো একটু ভিজতে হল। ফলে গায়ে কাঁটা দিয়ে বেশ শীতই করছে মীনার।

ঠিকানার নির্দেশ মতো ট্যাক্সি যে বাড়িটার ফটকের সামনে এসে দাঁড়াল, সেটা দেখা মাত্র ভিতরে কেমন যেন একটু ধাক্কা লাগল মীনার। কেন জানে না। ছবির মতো ছোট বাড়ি। দুধের মতো সাদা।....অমন নিষ্কলঙ্ক সাদা বলেই কি? দু'দিকে চোখ জুড়ানো ফুলের বাগান। নানা রঙের ফুল ফুটে আছে। ওগুলোরও এখন স্নানব্রত চলেছে। শুনেছিল ফুল আর শিকার নেশা। আসতে না আসতে একটা নেশা চোখে পড়ল। শিকারী কেমন?

বাগানের মাঝখান দিয়ে ছোট রাস্তাটা সিঁড়ির মুখে গিয়ে ঠেকেছে। গেট খোলাই ছিল।

ট্যাক্সি থেকে দোতলার দিকে মুখ তুলতে গিয়েও তুলল না। তার আগেই মনে হল কেউ একজন বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। এ-সব ব্যাপারে মীনার ষষ্ঠ চেতনা অতিমাত্রায় প্রখর।....ওই একজনই দাঁড়িয়ে আছে। রজত গাঙ্গুলি। না তাকিয়েও বলে দিতে পারে তার পরনে ট্রাউজার, গায়ে হাফশার্ট।...না তাকিয়ে এর বেশী আর কতটুকু বলতে পারে?

ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বেডিং আর সুটকেস নিয়ে আসতে বলে মীনা নেমে এক ছুটে গেট দিয়ে ঢুকে বারান্দায় এসে উঠল। ড্রাইভার ওর পিছনে এসে সুটকেস বেডিং আর শৌখীন ঝুপড়িটা বারান্দায় রাখল।

তার ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে মীনা শাড়ির আঁচলে মুখ মুছছে।

মুখ থেকে আধ-ভেজা শাড়ির আঁচল সরাতে হল। সামনে এসে দাঁড়িয়েছে কেউ। শাড়ির আঁচলটা তাড়াতাড়ি ভালো করে গায়ে জড়াতে জড়াতে মীনার ভিতরটা দ্বিতীয় দফা হোঁচট খেল কিনা জানে না। কলকাতায় বাস, অভিজাত মানুষের সংস্রবেও কম আসেনি। তার মধ্যে সুপুরুষ দু' দশজন হামেশাই দেখেছে। কিন্তু মীনার ভিতরটা হোঁচট খেল সামনে যে দাঁড়িয়ে সে সুপুরুষ বলে নয়, তার টানা আয়ত দুটো চোখ আর সেই দুটো চোখের দৃষ্টি দেখে। অমন ঘন-কালো আয়ত-পক্ষ শিশুর মতো সরল অথচ স্বচ্ছ এক জোড়া চোখ আর বোধহয় দেখেনি। ভাবুকরা হরিণ চোখের সঙ্গে মেয়েদের ডাগর চোখের তুলনা করে, কিন্তু এই চোখ দেখলে তারা কি বলবে জানে না।....কলকাতায় এর যে ছবি মীনাকে দেখানো হয়েছিল তার সঙ্গে সব মেলে, এই দুটো চোখ মেলে না। অবশ্য ছবির চোখের দৃষ্টি অন্যত্র নিবদ্ধ ছিল।

হঠাৎ মীনাই বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ে গেল কেমন। ওই দুটো চোখ তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত নেমে এলো। তারপর আবার উঠতে লাগল। এত কাছ থেকে এমন নিঃসঙ্কোচে কোন অপরিচিতের দর্শন-পর্ব সমাধা হতে পারে ধারণা ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে যেন চঞ্চল রায়চৌধুরীর ওকে সেই প্রথম দেখাটা মনে পড়ে গেল। সেই লোক হয়তো আরো একটু কাছে দাঁড়িয়ে নিরীক্ষণ করেছিল ওকে। কিন্তু সেই প্রথম দেখার মধ্যেও বাসনার আঁচ ছিল।....এ দেখার মধ্যে বাসনার ছিটেফোঁটাও নেই। এ যেন সরল বিস্ময়ে শুধু দেখে নেওয়াই।

অগত্যা মীনাই প্রথম দু'হাত জোড় করে বুকের কাছে তুলল।—আপনি মিস্টার রজত গাঙ্গুলি ?

মাথা নাড়ল। গায়ের রং না কালো না ফর্সা। একটু লালচে। মাথার ঝাঁকড়া চুলও লালচে। মাথা নাড়তে কতগুলো চুল কপালের ওপর নেমে এলো। সঙ্গে সঙ্গে পাশের সুটকেস আর বেডিংটা দেখে নিল।

মীনা বলল, আমি কলকাতা থেকে আসছি, মিস্টার—

শেষ করা গেল না। কয়েক পা এগিয়ে ভিতরের দরজার কাছে গিয়ে লোকটা হাঁক দিল, চিমন—!

গলার আওয়াজখানা আবার পরিপুষ্ট গম্ভীর। ডাকের রেশ মিলাবার আগেই একটা লোক ছুটে এলো। বয়েস চল্লিশের মধ্যে। রোগা ফর্সা। পরনে খাকী হাফ প্যান্ট আর খাকী শার্ট। আঙুল দিয়ে তাকে স্যুটকেস আর বেডিং দেখিয়ে দিয়ে রজত গাঙ্গুলি মীনার দিকে ফিরল। বলল, এর সঙ্গে ওপরে চলে যান, বাথরুমে গরম-ঠাণ্ডা দু'রকম জলই আছে। ডোণ্ট ইয়ুজ কোল্ড—গা-হাত-মাথা বেশ করে মুছে ভেজা শাড়িটা বদলে ফেলুন, এখানে এ-সময় জলে ভিজলে চট্ করে ঠাণ্ডা লেগে যায়।

মীনা তবু কিছু বলতে চেষ্টা করতে আবার থামিয়ে দিল।—যা বললাম আগে করে আসুন। চিমনকে হুকুম করল, চা—চা না, কফি বানিয়ে রাখ।

অগত্যা চিমনের পিছু পিছু অন্দরে পা বাড়ালো। সিঁড়ি ধরে দোতলায় উঠতে লাগল। মীনা হকচকিয়ে গেছে সন্দেহ নেই। এমনও মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়, যেন বাড়ির এই মালিকের নির্দেশ মতোই কোন মেয়েকে এখানে পাঠানো হয়েছে, জলে ভেজা সেই মেয়ের মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখে নিয়ে মোটামুটি পছন্দ হবার পর নির্লিপ্ত গাম্ভীর্যে সে অন্দরে ঢোকার নির্দেশ দিয়েছে। তবে সত্যিই এ-রকম মনে হয়নি বা হবে না ওই দুটো চোখের জন্য। বয়েসকালের বোকা মেয়েরাও পুরুষের চোখের ভাষা মোটামুটি পড়তে পারে। মীনা তো পারেই।···ওই দুটো চোখ যেন সভ্যজগতের কলাকৌশল জানে না, যা দেখার দেখে নেয় আর তারপর যা করণীয় সেটা নির্দেশ দেয়।

নির্দেশ ঠিক-ঠিক মানা গেল না। বাথরুমে ঢুকে ভালো করে স্নানটা সেরেই বেরুতে ইচ্ছে করল। বেশ করে স্নান করার পর ট্রেনের দু'রাতের ধকল কাটল। মাথার ধোঁয়াটে ভাবনা চিন্তার জট

ছাড়ল। খট্‌খটে শুকনো আর তাজা হয়ে সামান্য প্রসাধন সেরে দোতলার বারান্দায় বাড়ির মালিকের সামনে এসে বসতে প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় লেগে গেল। সত্যিই ভেতরটাও তাজা আর ঝরঝরে লাগছে এখন।

কফি-পট এগ-পোচ টোস্ট বাটার আর ফ্রুটস্‌ সাজিয়ে রজত গাঙ্গুলি তার প্রতীক্ষায় বসে আছে। হাতে বড়-সড় বিলিতি জার্নাল একটা। মনে হল ওতে পাঠ্যর থেকে রঙিন ছবিই বেশি। মীনা খুব নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছিল তবু টের পেল। জার্নাল থেকে মুখ তুলে তাকালো। এই মূর্তি দেখে দু'চোখ একটু প্রসন্ন যেন।

বসুন। ঘাড় ফিরিয়ে হাঁক দিল, ওরে চিমন, কফিটা আবার নতুন করে বানা—জুড়িয়ে গেছে।

মীনা ব্যস্ত হয়ে বলল, কিছু দরকার নেই, আমার এতেই হবে।

কিন্তু এ ক'টা কথার ফাঁকেই চিমন এসে যান্ত্রিক তৎপরতায় কফির ট্রে তুলে নিয়ে চলে গেল। রজত গাঙ্গুলি হাসি মুখেই মীনার দিকে তাকালো।—ও হুকুম বোঝে, হুকুম নাকচ বোঝে না।

হাসল মীনাও।—অনেকদিন আপনার কাছে আছে বুঝি?

আমার জন্মের ঢের আগে থেকে—মামাবাড়ির দাদুর কাছ থেকে ওকে ইনহেরিট করেছি।

এমন একজন বিশ্বস্ত অনুচরের অবস্থান খুব মনঃপুত হবার কথা নয়। বীরেন গুপ্ত বা কমল গাঙ্গুলি কেউ এর কথা বলেনি। বলা উচিত ছিল মনে হল। নতুন করে আবার তাহলে একটা লোককে চেনা-জানার ধকল পোহাতে হত না। এত কালের পুরনো লোককে একেবারে ফেলনা ভাববে কি করে?

চেয়ার টেনে তার মুখোমুখি বসে মীনা হাসল।—এসেই উৎপাত শুরু করেছি। আমি কে, কোত্থেকে এলাম তা বলারও ফুরসত হল না।

নাঃ, ওই দুটো চোখই মীনাকে ভোগাবে মনে হচ্ছে। এত স্বচ্ছ আবার একই সঙ্গে এত সরলও কারো চোখ হয়! এ কি রকম পাকা

শিকারী রে বাবা!....পুরুষের আবার একই সঙ্গে একটা শিশুরও হাসিমাখা চাউনি যেন দিব্বি সোজাসুজি ওর মুখের ওপর নড়েচড়ে একটা স্পর্শ বুলিয়ে দিয়ে গেল। তারপর পরিতুষ্ট মুখের জবাব শোনা গেল। বলল, আগের কাজ আগে সেরে নিন—খাবারও ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। তারপর আবার বলল, জলের মধ্যে সুটকেস-বেডিং নিয়ে ট্যাক্সি থেকে সোজা এখানেই নামলেন যখন, যোগাযোগের ব্যাপার কিছু আছে ধরেই নেওয়া গেছে।

বেলা তখন সাড়ে ন'টা হবে। প্রাতরাশ একজনেরই আসা স্বাভাবিক। তবু মীনা জিজ্ঞাসা করল, আপনার হয়ে গেছে?

অনেকক্ষণ। আপনার সঙ্গে কফি হবে 'খন আবার।

আহারে মন দিল মীনা। এই লোকের কথাবার্তা বা আচরণে তার বৈমাত্রেয় ভাই কমল গাঙ্গুলির সঙ্গে এতটুকু মিল নেই বটে। কিন্তু ভাবলে কিছু মিল একজনের সঙ্গে খুঁজে পাওয়া যায়। সমর গাঙ্গুলির সঙ্গে। আর কিছু না হোক আত্মপ্রত্যয় গোছের একটা ঋজু ভাবের মিল আছে যেন। মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভিতরটা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। এ-সময় এমনি বিপরীত প্রতিক্রিয়ার দরকার ছিল যেন।

খেতে খেতে বলল, আমার নাম মীনা দত্ত। কলকাতা থেকে আসছি, আপনার বন্ধু বীরেন গুপ্ত আপনার নামে একখানা চিঠি দিয়ে বললেন, স্টেশন থেকে বেরিয়ে সোজা ওখানে চলে যাবে—সব ব্যবস্থা ওখানকার মালিকই করে দেবেন। বলার সঙ্গে সঙ্গে হাসল একটু, তারপর যোগ করল, এই জলের হিসেবটা তাঁর বা আমার কারো মাথাতেই ছিল না অবশ্য।

ওই মানুষ যে রসিক বেশ, এক কথাতেই বোঝা গেল। হাতের জার্নাল টেবিলে ফেলে সকৌতুকে বলল, জলে পড়েছেন সেটা বুঝে ফেলেছেন তাহলে?

বীরেন গুপ্তর নাম শুনলে ভদ্রলোকের আগ্রহ বাড়বে ধরেই নিয়েছিল। কিন্তু চোখে পড়ার মতো অতটা দেখল না। জিজ্ঞাসা করল, বীরেন আপনার বিশেষ পরিচিত বুঝি?

হেসে জবাব দিল, তা বিশেষ বলতে পারেন। তাঁর স্ত্রীটি আমার বাল্য-সহচরী, তাই সুযোগ পেলেই ভদ্রলোক শালী সম্ভাষণ করেন, আর একটু-আধটু হামলা-টামলাও করে থাকেন।

হাসছে রজত গাঙ্গুলিও। শুনতে ভালো লাগছে বোঝাই যায়। ঠোঁটকাটার মতো মন্তব্যও করল, বীরেনকে ভাগ্যবান বলতে হবে।

নতুন কফির পট সমেত ট্রে হাতে চিমন সামনে এসে দাঁড়াল। লজ্জা এড়ানোর জন্যেই মীনা দু'হাত বাড়িয়ে ট্রে-টা তার হাত থেকে নিল। হাসিমুখে বলল, ডবল খাটতে হল তোমাকে।

হাসি বা কথা যা-ই হোক চিমনলালের পছন্দ হল বেশ বোঝা গেল। বড় বড় দাঁত বার করে হেসে চলে গেল।

দু'পেয়ালায় তৈরি কফি ঢেলে একটা পেয়ালা রজত গাঙ্গুলির দিকে এগিয়ে দিল মীনা। বলল, আপনার লোকটা বেশ হাসি খুশি মনে হচ্ছে।

রজত গাঙ্গুলি হাল্কা জবাব দিল, এ বাড়িতে মিষ্টি কথাও শোনে না মিষ্টি মুখও দেখে না, তাই একটু বেশি খুশি বোধহয়।

এত অল্প সময়ের মধ্যে আলাপটা এমন সহজ হয়ে আসছে দেখে মনে মনে খুশি মীনাও। সপ্রতিভ হাসিমুখে একবার তার দিকে তাকালো শুধু। নতুন আলাপে যতটুকু মানায় তার বেশি এগনো বোকামি। পুরুষ পল্কা ভেবে বসলে সেই রমণীর সমস্ত ছলাকলা সমস্ত চাতুর্য ব্যর্থ হতে বাধ্য।

কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে রজত গাঙ্গুলি জিজ্ঞাসা করল, এখানে বেড়াতে এসেছেন?

হ্যাঁ। ওয়েলফেয়ার অফিসারের চাকরি আমার, তাই নিজের ওয়েলফেয়ারটা আগে বুঝে নিই—ছুটি-ছাটা পেলেই বেরিয়ে পড়ি। বলার সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে ভিতরে শংকিত একটু। না বলাই ভালো ছিল, এক্ষুনি প্রশ্ন হবে হয়তো, কোথাকার ওয়েলফেয়ার অফিসার। তাই নিজে থেকেই আবার বলে গেল, এবারে বেশি দিনের মেয়াদে বেরিয়ে পড়েছি, এখানে যতদিন ভালো লাগে থাকব, ভালো না লাগলে আবার কোথাও পালাব।

হাসি মুখেই রজত গাঙ্গুলি মন্তব্য করল, তাহলে ভালো যাতে লাগে সে-চেষ্টায় তো আমাকে উঠে পড়ে লাগতে হয়।

অর্থাৎ, বেশি দিনের মেয়াদটা মীনা এখানেই শেষ করে গেলে তার আবার ভালো লাগবে। কি রকম মনে হল এই গোছের সরলতা এই মুখেই মানায়। অথচ বীরেন গুপ্ত বা কমল গাঙ্গুলির মুখে এই লোকের সুখ্যাতি কিছু শোনেনি। শিকার আর ফুল—ছুটো বড় নেশার সঙ্গে কিছু ছোট নেশার কথাও শুনেছে। আর তার দাছু সুরেশ গাঙ্গুলির অমন বিচিত্র উইল কেন সেই ফিরিস্তিও ভালোই জানা আছে।

মীনা চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। মুখের হাসিতে সুচারু লজ্জার মিশেল। ঘরে ঢুকে সুটকেস খুলে বীরেন গুপ্তর চিঠিটা বার করে ঘুরে দেখে বারান্দার চেয়ারে বসে ঘাড় ফিরিয়ে ওকেই দেখছে লোকটা। কিন্তু আশ্চর্য, চোখের এই স্তুতির মধ্যে চুরির লেশমাত্র নেই।

আবার সামনে এসে চিঠির খামটা তার হাতে দিল মীনা। চিঠিটা পড়ে টেবিলের ওপর রেখে রজত গাঙ্গুলি বলল, খেয়ে দেয়ে এ-বেলা বিশ্রাম-টিশ্রাম করুন, বিকেলের দিকে হোটেলের খোঁজে বেরুনো যাবে।...কিন্তু হোটেলে কি আপনার বেশি দিন ভালো লাগবে, আমার তো ছু'দিন না যেতেই একঘেয়ে লাগে।

হঠাৎই নির্দিষ্ট পরিকল্পনার মধ্যে একটা পরিবর্তনের ছক মগজে আঁচড় কেটে বসল মীনার। কলকাতায় বসে বীরেন গুপ্ত আর কমল গাঙ্গুলির সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেও এটা সম্ভব হবে ভাবেনি। চাউনিতে সুচারু বিড়ম্বনার অভিব্যক্তিটুকু স্পষ্ট করে তুলল আগে। তারপর দ্বিধা কাটিয়ে জিজ্ঞাসা করল, মাফ করবেন, আপনার স্ত্রী এখানে নেই?

প্রশ্ন শুনে লোকটা বেশ অবাক যেন। একটু চেয়ে থেকে ফিরে প্রশ্ন করল, বীরেন... মানে বীরেন গুপ্তর সঙ্গে আপনার কত দিনের চেনা জানা?

অনেক দিনের। তাঁর অ্যাটর্নী-আপিসে কয়েক বছর চাকরিও করেছি আমি।...কেন বলুন তো?

জবাবে মৃদু হাসল একটু। তারপর বলল, আমার স্ত্রী কোথাও নেই।

ও...! মীনার বিস্ময় আর বিড়ম্বনায় কৃত্রিমতার ছায়া মাত্র নেই। —কিন্তু আপনার ছোট ভাইয়ের তো... যাক, বীরেনদা হোটেল ঠিক করে দেওয়ার কথা লিখেছেন বুঝি?

আবারও অবাক একটু।—তাই তো লিখেছেন। কেন?

অপ্রতিভ মুখেই হাসতে হল। বলল, ওই ভদ্রলোক কি দুষ্টু দেখুন, আপনার সম্পর্কে এত বলেছেন শুধু এইটুকু বাদ—

কোন্‌টুকু বাদ?

এখানে আপনার স্ত্রী আছেন কি নেই, সেটুকু। যাক, বীরেনদা আর কি লিখেছেন?

আপনার পরিচয় দিয়ে আর ঢালাও প্রশংসা করে লিখেছে, শ্রীমতী সুরসিকা কিন্তু ভিতরে কড়া, কিছুদিন আমার ভালো কাটার সম্ভাবনা। ভালো মতো দেখাশুনা আর যত্নআত্তি করি যেন। আর লিখেছে, আপনি বেড়াতে খুব ভালোবাসেন, তাই এ-ক'দিন আমার গাড়ির অনেক তেল পোড়ার সম্ভাবনা। ....কিন্তু আপনি কি এ-বাড়িতেই থাকবেন ধরে নিয়ে এসেছিলেন নাকি?

না না, ঠিক আছে। অপ্রস্তুত মুখেই হেসে ফেলল মীনা। বলল, বীরেনদা সুরসিকা লিখেছেন কিন্তু ঠোঁটকাটা কতখানি লেখেননি।...উনি বলেছিলেন, আপনার এই ঠিকানায় পৌঁছুতে পারলেই আমার ভাবনা শেষ। এতক্ষণ ভাবছিলাম আপনার স্ত্রী বোধহয় সকালে কোথাও বেরিয়েছেন—তাই এমন সুন্দর বাড়ি অথচ আপনি হোটেলের কথা বলছেন শুনে অবাক হয়েছিলাম—তখন কি জানি আপনার কি অসুবিধে!

ব্যাপারটা বোধগম্য হল এতক্ষণে। সোজা মুখের দিকে চেয়েছিল রজত গাঙ্গুলি। এবার যেন চাউনিটা উৎসুক হয়ে উঠল একটু। ঠোঁটের ফাঁকেও হাসির আভাস।—আমার অসুবিধে কি, অসুবিধে তো আপনার!

হেসে ফেলেও একটা সত্যি জবাব না দিয়ে পারা গেল না যেন। মীনা বলেই ফেলল, আরো দশ বছর আগে থেকে অনেক ঘা—পোড় খাওয়া মেয়ে আমি, তাছাড়া বেড়াবার নেশায়ও কত জায়গায় কত রকমের পরিস্থিতিতে কাটিয়েছি ঠিক নেই—ভালো আর ভদ্র জায়গা হলে ও-রকম অসুবিধে-টসুবিধের পরোয়া করি না। যাকগে, ধারে কাছে ভালো হোটেল আছে তো?

মুখের কথা শেষ হতে না হতে কোথা থেকে নাক সুড়সুড় করে হাঁচি এসে গেল একটা। নাকে মুখে আঁচল চাপা দিয়েও সেটা ঠেকানো গেল না।

মুখের দিকে চেয়ে ছিল, হাত থেকে শাড়ির আঁচল ছেড়ে দিতেই ভদ্রলোক ঘাড় ফিরিয়ে হাঁক দিল, চিমনলাল!

তক্ষুনি হাজির। মীনা কোনরকম বাধা দেবার সুযোগ পাবার আগেই হুকুম হয়ে গেল, বারান্দার ওই কোণের ঘর এক্ষুনি রেডি করা হয় যেন—মেমসাহেব এখানেই থাকবেন।

মাথা নেড়ে লোকটা হুকুম পালন করতে ছুটল। অতি সহজে মীনা একটা বড় সমস্যার সমাধান করে ফেলেছে। ভিতরটা আনন্দে থলথল করে উঠছে। বাইরে অপ্রস্তুতের একশেষ। বলে উঠল, ছি-ছি, আপনি কি ভাবছেন ঠিক নেই, আমার সত্যিই হোটেলেও কোন অসুবিধে হবে না—

লোকটার মুখে খুশির আমেজ। মুখের ওপর দু'চোখ আটকে রেখে মিটিমিটি হাসতে লাগল। জবাব দিল, এরপর আপনাকে হোটেলে পাঠানোর কথা ভাবতেই আমার অসুবিধে হচ্ছে।

আরো বেশি হাসছে। অগত্যা মীনাও। কিন্তু কোথা থেকে অতর্কিতে আবার সেই হাঁচি। এবারে আর শাড়ির আঁচল তোলারও ফুরসৎ পেল না। একটা নয়, পর পর দুটো। একটু আগেও টের পায়নি। এখন মনে হল টাকরার কাছটা খুসখুস করছে।

হঠাৎ দ্বিতীয় আর তৃতীয় দফা হাঁচি শুনে ভদ্রলোকের দু'চোখ সোজা তার মুখের ওপর আবার। মীনা সত্যিই অপ্রস্তুত একটু। কোনদিন তো হাঁচি-কাশির বালাই নেই।

চান করেছেন ?

ট্রেনের দু'দিনের ধকল, চান না করে পারা যায় ! ও কিছু না—

ঠাণ্ডা জলে চান করেছেন না গরম জলে ?

সত্যি বিব্রত বোধ করছে একটু। হেসে বলল, শীতকালেও গরম জল গায়ে ছোঁয়াই না আমি—আপনি কিচ্ছু ভাববেন না।

একটা হাত বাড়ালো।—দেখি।

ঠিক না বুঝে মীনা জিজ্ঞাসা করল, কি ?

জবাব না দিয়ে ওর বাঁ হাত নিজের হাতে তুলে নিল। হাতটা বেশ বড়সড়। আঙুলগুলো লম্বাটে কিন্তু মোটা। নির্দ্বিধায় কব্জির কাছটা আঙুলগুলো দিয়ে একটু চেপে ধরে থেকে অনুভব করতে চেষ্টা করল।

মীনা চেয়ে আছে। কয়েক নিমেষ পলক পড়ল না চোখের। যা দেখতে চেয়েছিল এখনো তা দেখল না। এই পুরুষের ভেতর-বার একরকম। উদ্দাম হতে পারে হয়তো, সুযোগ বুঝে সুবিধে নিতে পারে বলে মনে হয় না মুহূর্তের মধ্যেই বুঝি এই সত্যটা স্পষ্ট হয়ে গেল মীনার কাছে।

হাত ছেড়ে দিল। মাথা নেড়ে বলল, দ্যাট্স ব্যাড। আপনার জ্বর আসছে। বর্ষার প্রথমেই জলে ভিজেছেন তার ওপর ঠাণ্ডা স্টোরড্ জলে স্নান। দাঁড়ান, ব্যবস্থা করছি—

ব্যস্ত পায়ে বারান্দার ও-মাথার ঘরে চলে গেল। একটু বাদেই ফিরল আবার। এক হাতে ব্র্যাণ্ডির বোতল, অন্য হাতের গেলাসে সিকিভাগ জল। দুটোই বারান্দার টেবিলের ওপর রেখে বসল।

ব্র্যাণ্ডি হুইস্কির তফাৎ জানে না মীনা। ও জিনিস মাত্রেই দু'চোখের বিষ। দেখলেই ভিতর থেকে একটা বিতৃষ্ণা ঠেলে বেরোয়। সভয়ে বলে উঠল, ও কে খাবে ?

আপনি। গরম জলের সঙ্গে ব্র্যাণ্ডি মিশিয়ে খেলে সর্দি পালায়।

মীনা বলে ফেলল, আপনি এ-ভাবে তদারক শুরু করলে আমি এক্ষুনি হোটেলে পালাব। আমি বলছি কিছুই হয়নি, আপনি ব্যস্ত হবেন না।

কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে গরম জলে মাপ মতো ব্র্যাণ্ডি মিশিয়ে গেলাসটা হাতে নিয়ে নাড়ল একটু।—আপনার নাকের ডগা লাল হয়েছে, আয়নায় দেখবেন। টুক করে ওষুধের মতো খেয়ে ফেলুন, আর ঝামেলা থাকবে না। বেশি গরম কিনা দেখে নেবেন—

নিরুপায়। গেলাস হাতে নিতে হল। বলল, বেশি গরমই মনে হচ্ছে, ঘরে নিয়ে গিয়ে খাচ্ছি।

জবাব না দিয়ে রজত গাঙ্গুলি ব্র্যাণ্ডির বোতল রাখতে গেল। সেই ফাঁকে গেলাস হাতে মীনা এদিকের কোণের ঘরে এসে ঢুকল। চিমনলাল এ-ঘরেই তার থাকার ব্যবস্থা করেছে।

ব্যবস্থা এর মধ্যে সেরেই গেছে চিমনলাল। সুন্দর পরিপাটি সাজানো ঘর। অ্যাটাচড্ বাথ। ঝকঝকে বেসিন। এতেও ঠাণ্ডা আর গরম জলের ট্যাপ লাগানো। সামনে বড় আয়না ফিট করা। এদিকের জানালায় দাঁড়ালে চারদিকে পাহাড়ের দেয়াল। দক্ষিণের ওগুলো শিবালিক পাহাড়ের সারি। নিচে তাকালে চোখ জুড়নো ফুলের বাগান।

ঘরে কেউ নেই দেখে মীনা হাতের কাজ আগে সেরে ফেলল। অর্থাৎ গেলাসের গরম জল আর ব্র্যাণ্ডি বেসিনে ঢেলে দিল। তারপর কল খুলে একসঙ্গে গেলাস আর বেসিন দুইই ধুয়ে ফেলল।

ঘরে পা দিয়েই অপ্রস্তুত একটু। চিমন দাঁড়িয়ে আছে। গেলাসের জন্যে হাত বাড়ালো। মীনা একটু হেসেই বলল, তোমার সাহেব ওষুধ না খাইয়ে ছাড়লেন না।

চিমন ড্যাব-ড্যাব করে মুখের দিকে চেয়ে রইল।—কিছু বলবে?

সাহেব নিচে নেমে গেলেন, আপনাকে জানাতে বললেন, আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরবেন।

কোথায় গেলেন বল তো? অকারণেই মীনা উৎসুক একটু।

বাজারে মেমসাহেব। গাড়িতে গেছেন, যাবেন আর আসবেন।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গাড়িতে স্টার্ট দেওয়ার আওয়াজ কানে এলো যেন। মীনা ঘর ছেড়ে আবার বারান্দায় বেরিয়ে এলো। আসার

সময় ফটকের পাশেই শাটার-টানা গ্যারাজ দেখেছিল। এখন গাড়িটা চোখে পড়ল। ক্রিম কালারের তকতকে ছোট গাড়ি। বিলিতি গাড়ি যে তাতে কোন ভুল নেই। মুহূর্তের মধ্যেই গাড়িটা চোখের আড়াল হয়ে গেল।

মীনা চুপচাপ ভেবে নিল একটু ··· টাকাকাড় তো সব কাকার কাছে আটকানো। অথচ দেখে শুনে খরচের হাত একটুও টান মনে হয় না। ভোগের মধ্যেই আছে ধরে নিতে হবে। টাকা-পয়সা আসে কোথা থেকে? এর নিজস্ব মামাবাড়ির অবস্থা ভালো শুনেছিল। সেদিকের উত্তরাধিকার সূত্রে কিছু বিত্ত লাভ হয়েছে হয়তো। হঠাৎ আপনা থেকেই কি-রকম একটা সন্দেহ উঁকিঝুঁকি দিল।···কাকা সমর গাঙ্গুলি তার বাপের আদেশ লঙ্ঘন করবে না হয়তো, কিন্তু এত আদরের ভাইপোকে নিজের টাকা দিতে অসুবিধে কি। তার নিজের রোজগারের টাকাও তো অঢেল শুনেছে।

এই সুন্দর পরিবেশে এসে পড়ার পর থেকে অনেক সময়েই হিংস্র সঙ্কল্পের দিকটা নিজের অগোচরে মনের তলায় চাপা পড়ছে। এই বাড়ির মালিকের আচরণও একটা কারণ। পরিণত বয়সেও এমন সহজ সরল ছেলেমানুষি হাবভাব আশা করেনি। সুরার নেশা আর নারীর নেশা যে লোকের তার আচরণ এ-রকম হয় কি করে উল্টে সেটাই যেন বিস্ময় একটু। কিন্তু এই একটা নাম, অর্থাৎ সমর গাঙ্গুলির নামটা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর সমস্ত ভিতরটা তীক্ষ্ণ সজাগ হয়ে ওঠে। সে এখানে কেন এসেছে এক মুহূর্তের জন্যে ভোলা উচিত নয়। ভুললে চলবে না। ভুলবে না। নিজের কল্পনায় রজত গাঙ্গুলির মুখখানা বাতিল করে সেখানে কেবল্ ম্যানুফ্যাকচারিং-এর ছোট সাহেব চঞ্চল রায়চৌধুরীর মুখটা দিলে কেমন হয়? সঙ্কল্পের ছুরিতে নতুন করে ধার পড়ে তাহলে।···কিন্তু চেষ্টা সত্ত্বেও সেটা সম্ভব হল না। আশ্চর্য রকম তফাৎ।

ঘুরে দেখল চিমন পিছনে দাঁড়িয়ে। জিজ্ঞাসা করল, কিছু চাই মেমসাহেব?

ওর মুখে মেমসাহেব ডাকটা কেন যেন ভালো লাগছিল না। লোকটা এ-রকম অতিথি পেয়ে খুশি হয়েছে মুখ দেখলেই বোঝা যায়। হেসেই বলল, না এখন আর কি চাইব! কি ভেবে জিজ্ঞাসা করল, সাহেবের রান্নাবান্না সব তুমি কর?

সব আমি করি মেমসাহেব।

তোমার সাহেব কি-কি খেতে ভালোবাসেন সব জানো?

ও সাদা সাপটা জবাব দিল, সাহেব সব খেতে ভালোবাসেন মেমসাহেব।

মীনা হেসে ফেলল। সেই সঙ্গে সাহেবের সঙ্গে মেমসাহেবের জোড় মেলানোটাও খট করে কানে লাগল। মিষ্টি ভ্রূকুটি করে বলল. আমাকে তুমি মেমসাহেব মেমসাহেব করছ কেন, মেমের কি দেখলে আমার মধ্যে।

লজ্জা পেলে ফ্যাকাশে রোগাটে মুখটা বেশ দেখায় চিমনলালের। জবাব দিল, সাহেব যে গোড়াতেই বলে দিলেন মেমসাহেবের ঘর ঠিক করতে....।

মনে মনে মুখ ভেঙচাতে ইচ্ছে করল মীনার। সাহেবের সঙ্গে মিল রেখে এই লোকটারও যেন ওকে মেমসাহেব বানানোর সখ। একটু গম্ভীর হয়ে বলল. আমি মেমসাহেব-টাহেব নই, আমাকে দিদিমণি বলে ডাকবে—বুঝলে?

বিগলিত চিমনলাল জবাব দিল, জি মেমসাব।

বাড়ির যে কোন দিকে তাকালে ভদ্রলোকের রুচির পরিচয় মেলে। দোতলায় এই ঘোরানো বারান্দার ওদিকের শেডের নিচেও গোটাকতক ফুলের টবে সুন্দর ফুল ফুটিয়েছে। চিমনলাল জানালো মালী থাকলেও সাহেব নিজের হাতে বাগানের কাজ করেন। বারান্দার দেয়ালে তিনটে পেল্লায় হরিণ আর শম্বরের শিং। ওগুলোর গা দিয়ে যেন তেল চুঁয়ে পড়ছে।

বারান্দার এধারে সামনে পিছনে দুটো ঘর। তার একটায় মীনা থাকছে। ভিতর দিয়ে অন্য ঘরের দরজা। এ দুটো অতিথিদের জন্য

বরাদ্দ বোঝা গেল। মাঝেরটা হলঘর। এখানেও বসার ব্যবস্থা, আলমারিতে বই-পত্র। দু'কোণের স্ট্যাণ্ডের ওপর একটা বাঘের আর একটা ভালুকের মাথা। দেওয়ালে মস্ত একটা হাতির দাঁত। বারান্দার ওপাশের বড় লম্বাটে ঘরটা মালিকের। হলের পিছনে ডাইনিং স্পেস, কিচেন। অন্য দিকে সিঁড়ি।

একতলাটা খালিই পড়ে থাকে ভেবেছিল। কিন্তু চিমনলাল জানালো তা না, সাহেব একতলাটা নিজের কাজে ব্যবহার করেন। পশমের কম্বল, পশুর চামড়া, শুকনো ফল আর অনেক রকমের ফুল ফলের বীজের স্টক থাকে ওখানে—সে-সব চালান দিয়ে সাহেব থোকে থোকে ভালো টাকা রোজগার করেন। আবার অনেক সময় এমনিতেও বিলিয়ে দেন সে-সব। শেষে উপসংহার, সাহেবের মর্জি এতকালের মধ্যেও সে ভালো বুঝে উঠতে পারল না।

মীনা জিজ্ঞাসা করল, তোমার সাহেব মস্ত শিকারী বুঝি?

খুব। এক জমিতে সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে বাঘ মেরেছেন।

এখানে বাঘ আছে?

না, এখানে চিতাবাঘ হায়েনা ভালুক বুনো হাতি—এ-সব আছে। বড় শিকার করতে হলে সাহেব বাইরে চলে যান।

লোকটাকে দেখার পর ঠিক এতখানি স্নায়ুর জোর মীনা কল্পনা করতে পারে না। বিশেষ করে চোখ দুটো যার স্বচ্ছ হলেও এত সরল!

এরই মধ্যে কম করে আরো বিশ ত্রিশটা হাঁচি হয়ে গেছে। আর টাকরার কাছটা আরো বেশি সুড়সুড় করছে। আয়নায় দেখেছে, শুধু নাকের ডগা নয়, সমস্ত মুখটাই লাল। শরীরটাও বেতালা লাগছে কেমন। একটু শীত শীত ভাব। নিজের শরীরটার ওপর অগাধ আস্থা মীনার। স্মরণীয় কালের মধ্যে জরজ্বালা হয়েছে বলে

মনে পড়ে না। তাই এই উৎপাতটা একেবারেই হিসেবের মধ্যে ছিল না। হোটেলের বদলে এত সহজে এ-বাড়িতেই আস্তানা জুটিয়ে ফেলার পর যে আত্মতুষ্টিতে ডগমগ হয়েছিল, এ যেন তার বিপরীত জবাব। অসুস্থ হয় না বলেই অল্পেতে কাতর কিনা বুঝতে পারছে না, দু'পায়ের ওপর দাঁড়াতেও কষ্ট হচ্ছে এখন।

আধঘণ্টার বদলে প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে ফিরল রজত গাঙ্গুলি। সাড়া পেয়েই মীনা তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো। শরীরের ব্যাপারটা বুঝতে না দেবার তাগিদ। তার সঙ্গে একরাশ বাজার। চিমন সে-সব নিয়ে দোতলায় উঠে আসছে।

ওর দিকে ফিরে মনিব বলল, ভালো রান্না না হলে তোর আজ গর্দান যাবে। মীনার দিকে ফিরে হাসল।

মীনা বলল, এক্ষুনি আপনার বাজারে ছোটাছুটির কি দরকার পড়েছিল—

হৃষ্টমুখে রজত গাঙ্গুলি জবাব দিল, অতিথি বলে কথা—

এই মুখের দিকে তাকালে সহজ হতে কোন মেয়েরই বোধহয় সময় লাগে না। মীনাও হাসিমুখে বলল, এই অতিথিকে চেনেন না, বাজার যখন করেই এনেছেন, রান্নার ব্যাপারটাতে আমিই হাত লাগাব ভাবছি—

না না, চিমন খুব ভালো রাঁধে, ও ব্যাটার রান্নার জোরেই কেমন বহাল তবিয়ত দেখছেন না। আবার হাসতে গিয়ে ওই টানা ডাগর চোখ মুখের ওপর থমকালো। সঙ্গে সঙ্গে চিমনের সামনেই খপ্ করে ওর একখানা হাত নিজের হাতে তুলে নিল। তারপর হাত আর না ছেড়ে সোজা ঘরে টেনে নিয়ে এলো তাকে। বিছানা দেখিয়ে বলল, শুয়ে পড়ুন।

কি কাণ্ড, আপনি এত—

আঃ, শুয়ে পড়ুন বলছি!

কি মুশকিল, শরীরটা একটু গরম হয়েছে বলে আপনি শাসন শুরু করে দেবেন নাকি!

হেসে ফেলল। তারপর চটকরে ঘর ছেড়ে চলে গেল। তারপর দু'মিনিটের মধ্যে একটা থার্মোমিটার ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে ফিরে এলো। কথা নেই বার্তা নেই, নিজের হাতেই ওটা মুখে গুঁজে দিল।

হাতঘড়িতে সময় দেখে মুখ থেকে থার্মোমিটার টেনে নিল। দেখে বলল, একশো পয়েন্ট ছয়, আরো উঠবে—

কথা বলারও অবকাশ না দিয়ে বাথরুম থেকে থার্মোমিটার ধুয়ে নিয়ে এলো। সত্যি বিব্রত বোধ করছে মীনা। থার্মোমিটার ড্রেসিং টেবিলের ওপর রেখে রজত গাঙ্গুলি হাঁক দিল, চিমনলাল!

সে ছুটে এলো।

মেমসাহেবের ভাত চলবে না, চাপাটি বানিয়ে রাখ। তাও চলবে কিনা বলা যায় না।

চিমন চলে যেতে মীনা বলল, তাও চলবে না, তার আগেই আমি কোন হোটেলে চলে যাব!

বেশ কথা। হাসছে।—আপনি হোটেলে গিয়ে ওঠার দশ মিনিটের মধ্যে হোটেলের ম্যানেজারকে তুলো ধোনা করব—পাবলিক হোটেলে রোগী রাখা হয়েছে কোন্ আক্কেলে!

হাসছে মীনাও।—বেশ, তাহলে হাসপাতালে চলে যাব।

রজত গাঙ্গুলি চেয়ে আছে। হাসিমাখা চাউনিটা নিজের অগোচরেই ওর মুখের ওপর তন্ময় যেন। লজ্জা পেয়ে মীনা বলল, কি দেখছেন, আর জ্বর-টর বাড়বে না।

ঠোঁটের ডগায় হাসি ভাঙল। এবারে সেই ছেলেমানুষি চাউনি। বলল, না....জ্বরে কাবু হলে কাউকে যে আরো বেশি ভালো দেখায় জানতুম না। হেসে উঠল, আমি থাকলে আপনার শোবার অসুবিধে হচ্ছে, শুয়ে পড়ুন।

চলে গেল। মীনার হঠাৎ মনে হল, সে যদি কোন উদ্দেশ্য বা পরিকল্পনা না নিয়ে এখানে আসত আর এই লোকের সঙ্গে পরিচয় হত? সঙ্গে সঙ্গে নিজের ওপরেই ফুঁসে উঠতে চাইল মীনা। কোন রকম দুর্বলতার প্রশ্রয় সে দেবে না, দিতে পারে না। সমর গাঙ্গুলি শত্রু। পুরুষ শত্রু!

বেলা তিনটেয় থার্মোমিটারে আবার গায়ের তাপ দেখে গেল রজত গাঙ্গুলি। দেড় জ্বর। এর মধ্যে আরো কতবার এসেছে ঠিক নেই। এরপর মীনা যা ভয় করছিল তাই। নিজের ঘর থেকে টেলিফোনে ডাক্তারকে খবর দেওয়া হয়েছে। সে এসে হাজির।

ডাক্তারটি অবাঙালী। নাম যোশী। বাড়ির মালিকের বন্ধুস্থানীয়। সে রোগ দেখবে কি এ-রকম একজন রোগিনীকে এখানে দেখে অবাক হবে? তার চোখ মুখ ক্ষণে ক্ষণে উৎসুক হতে দেখল মীনা।

রোগী দেখতে পাঁচ মিনিটও লাগল না। হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে মামুলি জ্বর যে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করল, ওষুধ কিছু পড়েছে?

রজত গাঙ্গুলি জবাব দিল, গরম জলের সঙ্গে একটু কড়া ডোজের ব্র্যাণ্ডি খাইয়ে দিয়েছিলাম সকালে, আর কিছু নয়—

দরজার কাছে চিমন দাঁড়িয়ে ছিল। হাবাগোবা মুখ করে সেখান থেকেই সে জানান দিল, সে বিরাণ্ডি তো দিদিমণি বেসিনে ঢেলে দিয়েছেন—

মীনা অপ্রস্তুতের একশেষ। রজত গাঙ্গুলি সবিস্ময়ে তাকালো তার দিকে। ডাক্তার হেসে উঠল।

রজত গাঙ্গুলি চিমনের দিকে ফিরল—বেসিনে ঢেলে দিয়েছেন তুই দেখেছিস?

বাথরুমের দরজা খোলা ছিল, আমি আয়নায় দেখলাম গেলাসের সব বিরাণ্ডি ঢেলে দিলেন।

এরা দুজন হেসে উঠতে নিরুপায় ভ্রূকুটি করে মীনা বলল, ওই গন্ধ নাকে গেলেই সব উঠে আসে আমার। পলকা ধমকের সুরে চিমনকে বলল, তোমাকে এ-সব কে দেখতে বলেছিল!

বলল বটে, কিন্তু মনে মনে খুশিও। এভাবে ধরা পড়ার ফল ভালো ছেড়ে মন্দ কিছু হতে পারে না। ডাক্তার আর বাড়ির মালিক দুজনেরই চোখে ভালো লাগার আমেজ দেখছে।

প্রেসক্রিপশন লেখার জন্যে ডাক্তারকে নিয়ে মাঝের হলঘরে গিয়ে বসল রজত গাঙ্গুলি। চিমনকে হুকুম করল, চট্ করে চা বানাতে।

মীনা আবার শুয়ে পড়েছিল। কিন্তু শুতেও ভালো লাগছে না আর। খানিক বাদেই উঠে পড়ল। ভিতরের দরজা দিয়ে পায়ে পায়ে সামনের ঘরে এলো। ওদিক থেকে ডাক্তারের হাসি শোনা যাচ্ছে। মীনার কি রকম মনে হল এই হাসির কারণ সেও হতে পারে। দাঁড়িয়ে গেল। এবারে সিঁড়ির দিকে গলা শোনা গেল ডাক্তারের। সে বলছে, এ রকম অতিথি মেলা ভাগ্যের কথা, উইশ ইউ বেস্ট অফ লাক্—বল তো অসুখটা একটু বাড়তে দিয়ে তোমাকে একটু সেবা করার সুযোগ করে দিই—

তুমি একটা রাসকেল! বাড়ির মালিকের উৎফুল্ল গলা।

মীনা নিঃশব্দে নিজের বিছানায় এসে বসল আবার। শরীরটা এভাবে বেতাল্লা হবার ফলে নিজের ওপরেই বিরক্তি বাড়ছিল। হঠাৎ গেল সেটা। ওপরঅলার এই কারসাজির সুফলই চোখে পড়ছে এখন। চট করে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠার ব্যাপারে এই নাটকের যেন প্রয়োজন ছিল।

রজত গাঙ্গুলি ঘরে এসে ডাক্তারের চেয়ারটাতে বসল। নিশ্চিন্ত মুখ এখন। যোশী বলল, বুকে সর্দি-টর্দি বসেনি, দুই একদিনের মধ্যেই সেরে যাবেন।

সেরে তো যাবই, আপনিই মাঝখান থেকে নিজে ব্যস্ত হয়ে আমাকে অপ্রস্তুত করছেন।

আপনি অসুখ বাধাতে গেলেন কেন?

মীনা হাসল, আমার সত্যি কখনো কোন রকম অসুখ-বিসুখ হয় না।

এবারে মুখে এক ধরনের পলকা গাম্ভীর্য টেনে আনল রজত গাঙ্গুলি।—এই দেরাদুন যে মহাভারতের দ্রোণাচার্যের বাসস্থান তা জানেন?

কি রকম?

তেমনি হাল্কা গাম্ভীর্যে মাথা নেড়ে রজত গাঙ্গুলি বলল, আগে নাম ছিল কেদারখণ্ড, মানে শিবভূমি—তাই থেকে এদিকের পাহাড়ের

নাম শিবালিক। দ্রোণাচার্যের বসবাসের ফলে জায়গার নাম হয়েছিল দ্রোণ—দ্রোণের ডেরা থেকে ডেরাডুন। গুরুর দেশে এসেই গুরু-বাক্য অমান্য করলে ফল ভোগ করতে হবে বই কি। আপনাকে ঠাণ্ডা জলে স্নান করতে বারণ করেছিলাম, আপনি এসেই তাই করলেন।

মীনা হাসতে লাগল।—আপনি আমার গুরু?

সাময়িক গার্জেন যখন, গুরুতুল্য।

হ্যাঁ, দু'তিন দিনের মধ্যেই মীনা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে। লোকটার যত্ন-আত্তি আর খাওয়ার ব্যাপারে পীড়াপীড়ির ফলে দুর্বলতার লেশমাত্র নেই।

হঠাৎ ও রকম একটু শরীর খারাপ হওয়াটা ভাগ্যের অনুকূল ব্যাপারই বটে। মাত্র তিনটি দিনের মধ্যে এতখানি হৃদ্যতার মূলে ওই অসুখটা।

ছয়

কিন্তু প্রস্তুতি সত্ত্বেও দিনগুলি সত্যিই অদ্ভুত আনন্দের মধ্যে কেটে যেতে লাগল। এমন যে, এক একসময় মীনার নিজেরই সঙ্কল্প ভুল হয়ে যায়। তারপর নিরিবিলি অবকাশে নিজেকে চোখ রাঙায়, শাসন করে। আরো সহজ আরো অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে সময় লাগছে না।

প্রথম শুরু হয়েছিল রান্না দিয়ে। ভালো হবার দু'দিন পরে পর্যন্ত ওকে নিয়ে কোথাও বেরুতে রাজি হয়নি। ফলে তোয়াজের

এই দিকটাই প্রথম বেছে নিয়েছে মীনা। খাওয়ার ব্যাপারে লোকটার লোভ লক্ষ্য করেছে।

ও কি দিয়ে কি করছে ভেবে না পেয়ে চিমনলাল যেমন অবাক, সামনে চেয়ার টেনে বসে তার প্রভুও তেমনি। ও কিছু রান্না করতে এলে কাছ থেকে নড়তে চায় না।

গোড়ার দিনে ঠাট্টাও করল, এক্সপেরিমেন্টটা কি আমার ওপর দিয়ে চালানো হবে?

মীনা হেসে জবাব দিয়েছে, বরদাস্ত না হলে ফেলে দেবেন—আপনার অভাব কি।

খাওয়ার পর আনন্দে আটখানা। খুশি মুখে চিমনকেই চোখ রাঙিয়েছে, ওরে ব্যাটা, এতদিন যে তোকেই আমি দ্রৌপদীর আসল চেলা ভাবতাম—শিখে নে, শিখে নে—এরপর এ রকম রান্না করে দিতে না পারলে তোর মাথাটাই চিবিয়ে খাব।

লোকটার মধ্যে সত্যিই একটা শিশু প্রকৃতি আছে। ফলে সঙ্কোচ গিয়ে মীনারও হৈ হুল্লোড় হম্বিতম্বি বাড়ছে। দিন দশ বারো না যেতে এই অন্তরঙ্গতা যে লোকটার ভালো লাগার দিকে ঘেঁসছে, তাও অনুভব করতে পারে। এটুকুই লক্ষ্য ছিল। আর এই লক্ষ্যের প্রতি আস্থাও ছিল। চেহারা পত্রে স্বাস্থ্যে বিধাতার কিছু অনুকম্পা আছেই ওর ওপর। আর, প্রাণপ্রাচুর্যে নিজেকে ভরাট করে তুলতেও সময় লাগে না। তুইই পুরুষের লোভনীয়।

ভদ্রলোকের আর একটা নেশা লক্ষ্য করেছে মীনা। স্টীয়ারিং ধরলেই তুমুল স্পীডে গাড়ি চালায়। মীনার স্বভাবের সঙ্গে মিলেছে ভালো। সকালে বিকেলে রোজই ওকে নিয়ে দূরে দূরে চলে যায়—পাহাড়ের দিকে, নয়তো দূরের জঙ্গলের দিকে। ভদ্রলোকের জঙ্গলই পছন্দ বেশি। সঙ্গে বন্দুক থাকে। পাকা শিকারী, জঙ্গল দেখলেই হাত নিশপিশ করে বোধহয়।

পনেরো দিনের মধ্যে দেখার বা বেড়ানোর মতো নতুন জায়গা থাকল না। গাড়িতেই তার সঙ্গে বাইশ মাইল দূরের মুসৌরি ঘুরে

এসেছে। শহরতলীর রাজজী ম্যাংচুয়ারিতে বেড়াতে গেছে। দূরের সহস্রধারা গন্ধক প্রস্রবণে গিয়ে চুনা পাথরের গুহায় ঢুকেছে।

সেদিন বত্রিশ মাইল গাড়ি হাঁকিয়ে ওকে কালসিতে যমুনার ধারের অশোকের শিলালিপি দেখাতে নিয়ে এলো। চমৎকার ছবির মতো জায়গা।

মীনা মুগ্ধ হয়ে দেখছিল। হঠাৎ ওর চোখে পড়ল তন্ময় হয়ে লোকটা ওকেই দেখছে।

চোখাচোখি হতে হাসল। দুষ্টু দুষ্টু মিষ্টি মিষ্টি ছেলেমানুষি হাসি। বলল, এটা যে একটা পুণ্যস্থান স্বীকার করেন কি না?

মীনা মাথা নেড়ে সায় দিল। করি।

একটা পাথরের ওপর আরাম করে বসল সে। বলল, আসুন তাহলে, এখানে বসে যার যার মনের কথা কবুল করা যাক।

মীনা সচকিত একটু। হেসে তাড়াতাড়ি করে বলল, কবুল করার মতো আমার কিছু মনের কথা নেই।

ফোঁস করে বড় নিশ্বাস ফেলল একটা।—আমার দুর্ভাগ্য। কিন্তু আমার কবুল করার আছে।

পরিবেশ দেখার ফাঁকে মীনা আড়চোখে মুখখানা দেখে নিল একবার। হ্যাঁ, অবধারিত লক্ষ্যের দিকেই এগিয়ে চলেছে বটে। স্বাভাবিক ঠাট্টার সুরে বলল, কবুল করে ফেলুন তাহলে।

ভারী টানা গলায় বলে গেল সে, আজ ষোলটা দিন ধরে ভারী আশ্চর্য একটা স্বপ্নের ঘোরে ভেসে চলেছি আমি। আমার মন বলছে, গোটা জীবনটাই যদি এমনি ভাবেই কেটে যায়—তাহলে কি হয়?

মীনা ফস করে বলে বসল, হঠাৎ শক্ত মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়তে হয় তাহলে।

তারপরেই খিলখিল হাসি। মুখের দিকে চেয়ে আরও বেশি হাসি পেয়ে গেল। ছবি তোলার জন্যে কাঁধ থেকে ক্যামেরা নামাতে রজত গাঙ্গুলিও হেসে ফেলল। বেড়ানোর সঙ্গে এই ছবি তোলার

ব্যাপারটাও জমিয়ে তুলেছে মীনা। নিজের সেই দামী ক্যামেরা সঙ্গে। বাড়িতে বাইরে অনেক ছবি তুলে ছেড়েছে—আবার স্পীড আর টাইমিং দিয়ে ছুটে এসে তার পাশে দাঁড়িয়ে বা বসে পড়ে দুজনের একসঙ্গে ছবিও তুলেছে।

সেদিন পাহাড়ের দিকে বেরিয়ে এই করতে গিয়ে একটা কাণ্ডই ঘটে গেল। টাইম দিয়ে ক্যামেরা প্রেস করে ছুটে এসে তার পাশে বসতে গিয়ে টাল সামলাতে না পেরে গায়ের ওপরেই পড়ে গেল প্রায়। রজত গাঙ্গুলি ধরে না ফেললে অল্পস্বল্প আঘাতও লাগতে পারত। লজ্জার একশেষ তারপর। সেই ছবিই উঠে গেছে।

ছবি দেখে রজত গাঙ্গুলি হেসে বলেছে, এই শট্‌টা আর একবার হয় না?

ইচ্ছে করেই মীনা এক আধ দিন বেড়ানোর প্রোগ্রাম বাতিল করতে চেয়েছে। বলেছে, আপনি ঘুরে আসুন, আমি বরং চিমনের সঙ্গে বসে আপনার জন্যে কিছু রান্না করি।

ব্যস, লোকটার বেড়ানোর আনন্দই মাটি যেন। মুখ বেজার করে বলেছে, এটা কি সুবিচার হল?

কেন, ভালো খেতে তো আপনার ভালোই লাগে। তাছাড়া চিমন বলছিল, সাহেবের জন্যে আরো কিছু রান্না শিখিয়ে দিয়ে যাও দিদিমণি।

রজত বলল, ও ব্যাটার আজ আমি চাকরি খাব। আমার এই খিদে দেখলে ও নিজেই আপনাকে ঠেলে বার করতে চাইবে।

সঙ্গে সঙ্গে ক্রুদ্ধ হাঁক পাড়ল, চিমনলাল!

মীনা তাড়াতাড়ি বাধা দিল, থাক থাক, চলুন বেরুচ্ছি।

ওদিকে চিমনলালও এসে হাজির। মালিক চোখ পাকালো, তুই খুব বেয়াদপ হয়েছিস আজকাল—কেমন?

সবিনয়ে চিমনলাল বলল, জি সাব।

বেড়াবার নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্য ছিল না সেদিন। দূরের একটা পাহাড় নিশানা করে গাড়ি ছুটিয়েছে। মীনা পাশে। স্পীড

বাড়ছেই। হাওয়ায় মীনার খোলা চুল উড়ছে। বার বার হাত দিয়ে সরাতে হচ্ছে।

ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে রজত গাঙ্গুলি বার বার দেখছে। ছোট ছেলের মতোই মিটিমিটি হাসছে। আরো ছোট ছেলের মতো মনে হয় চোখ দুটোর জন্য।

বার বার এ রকম হতে ছদ্মকোপে মীনা চোখ পাকালো। —অ্যাকসিডেন্ট করবেন?

কেন, ভয় করছে?

ঠোঁটের ফাঁকে হাসি আটকে মীনা জবাব দিল, আপনার চোখ দুটো সামনের দিকে রেখে গাড়ির দৌড় দেখান—একটুও ভয় করবে না।

তেমনি হাসতে লাগল রজত গাঙ্গুলি। আর, আরো বেশি ফিরে ফিরে দেখতে লাগল।

কি দেখছেন?

আপনাকে।

কেন?

খুব ভালো লাগছে।

মীনা জোরেই হেসে উঠল। তারপর হালকা অনুশাসনের সুরে বলল, দেখুন মশাই, আপনারা মস্ত লোক, আপনাদের ভালো লাগালাগি অত ধাতে সয় না, বেশি ভালো লাগতে শুরু করলে কেটে পড়ব কিন্তু।

ছেলেমানুষের মতোই জিজ্ঞাসা করল, ভালো লাগলে কি করব?

পস্তাবেন। মীনা হেসে উঠল।

একটু বাদে হালকা সুরেই রজত গাঙ্গুলি জিজ্ঞাসা করল, আমরা মস্ত লোক আপনাকে কে বলল?

বীরেনদার মুখে এই রকমই শুনেছিলাম।

ইচ্ছে করে ও ভুল বুঝিয়েছে আপনাকে। মস্ত লোক হল গিয়ে আমার ভাই কমল। তার সঙ্গে আলাপ আছে আপনার?

ভিতরে সতর্ক হবার পরিস্থিতি এটা। হালকা জবাব দিল, খুব।

তাকে কেমন লাগে?

ভালোই। মুখ টিপে হাসল মীনা।—তবে স্বভাব চরিত্রে আপনার উল্টো।

রজত গাঙ্গুলি অ্যাক্সেলারেটারে আরও চাপ দিয়ে স্পীড বাড়িয়ে হেসে উঠল, আমার তো স্বভাব চরিত্র বলতে নেইই কিছু। তিন তিনবার প্রেমে পড়তে বুড়ো দাদুর সে কি রাগ আমার ওপর! দাদুকে দেখেছেন?

না। মীনার কৌতূহল যথার্থ।—তিন তিনটে প্রেমের একটাও টিকল না?

কি করে টিকবে। অম্লান বদনে নিজের দোষই স্বীকার করল যেন।—প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়ে যেতাম। তারপর দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম করে দর্শন যত বাড়ত প্রেম তত উবে যেত।

খিলখিল করে হেসে উঠল মীনা। মজার মানুষই বটে।

রজত গাঙ্গুলি আবার জিজ্ঞাসা করল, আমার কাকা সমর গাঙ্গুলিকে চেনেন?

হ্যাঁ। এই অবিমিশ্র আনন্দের মুহূর্তে এই নামটা শোনার দরকার ছিল। নইলে এমন এক মানুষের সান্নিধ্যে অনেক সময়েই কর্তব্য ভুল হয়ে যায়।

খুব চিনি। বীরেনদার কাছে তিনিই তো প্রথম আমাকে চাকরিতে পাঠিয়েছিলেন।

গাড়ির গতি কমল একটু। ফিরে তাকালো। বলল, ভুলে গেছলাম, মনে পড়ছে বটে এখন।

মীনা সাদাসিধে ভাবেই জিজ্ঞাসা বলল, কি মনে পড়ছে?

বছর চারেক আগে বীরেন একটা চিঠিতে লিখেছিল, কাকা ওকে একটি সুশ্রী আর স্মার্ট স্টেনোগ্রাফার উপহার দিয়েছেন। বীরেনটা এক নম্বরের গাধা।

কেন?

নইলে হাতে পেয়েও আপনাকে ছেড়ে দেয়!

বেশ। মীনা হাসছে, বেশি মাইনের চাকরি পেয়ে গেলে না ছেড়ে কি করবেন?

হৃষ্টমুখে মন্তব্য করল, আমি হলে সেই বেশির ডবল দিয়ে ধরে রাখতাম।

চাউনিতে ছেলেমানুষি, কিন্তু কথাবার্তা অদ্ভুত। ভিতর ছুঁয়ে যাবেই। এই লোকের মারফতই কিনা জীবনের সব থেকে বড় ফয়সালা তার। মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখের হাঁসি ধারালো হয়ে ওঠার উপক্রম।

মীনা লক্ষ্য করেছে খুব ভোরে ওঠে লোকটা। বারান্দায় চেয়ারে একটা বই-টই নিয়ে পড়াশুনার মধ্যে পশু পাখি ফুল আর শিকারের বই বা জার্নাল পড়ে। প্রথম প্রস্থ চা খেয়ে নিচের ফুলের বাগান তদারক করতে নামে। মালিটা তখন পিছনে পিছনে ঘোরে শুধু। পরিচর্যা যা করার তখন নিজের হাতেই করে ভদ্রলোক।

দোতলার ঘোরানো বারান্দার শেডের নিচে ফুলের টবে যে-সব ফুল ফুটিয়েছে, সেগুলোর পরিচর্যা সবটাই নিজে করে। সেদিন একটা টবের মাটি বেশ করে নিড়িয়ে দিতে দিতে আর মাঝে মাঝে সাদা কি গুঁড়ো ছড়িয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করল, এটা কি গাছ জানেন?

ছোট গাছ। তাতে খুব ছোট ছোট নীল ফুল। নীল আভা যেন ঠিকরে পড়ছে। মীনা মাথা নাড়ল।—চিনলাম না।

রজত গাঙ্গুলি বলল, বিষবৃক্ষ।

মীনা উৎসুক।—কি রকম?

এর একটি ফুল বা পাতার রস উদরস্থ হলেই সব শেষ।···পাহাড়ের একটা আদিবাসী আমাকে চিনিয়েছিল। যাচাই করতে গিয়ে অনেক প্রাণী হত্যা করেছি।

মীনা সভয়ে থমকে চেয়ে রইল গাছটার দিকে।

লোকটা মারাত্মক বিষ ঘাঁটাঘাঁটি করে মজা পায় কিনা জানে না। আর একদিন দেখল, বড় তুলিতে করে একটা আধ-কাঁচা চামড়ার উল্টো দিকে শিশি থেকে আরক ঢেলে ঘষছে সঙ্গে সঙ্গে চামড়ার খসখসে দিকটা একেবারে মসৃণ হয়ে যাচ্ছে।

কেমন মসৃণ হল দেখার লোভে মীনা চামড়াটায় একবার হাত বোলালো। হাতটা চিড়চিড় করে উঠল কেমন। সঙ্গে সঙ্গে মানুষটা অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠে তুলি ফেলে মীনার সেই হাত শক্ত মুঠোয় চেপে ধরে হিড়হিড় করে বাথরুমে টেনে নিয়ে গেল। মীনা হতভম্ব।

অনেকবার করে ডেটল আর সাবান জলে হাত ধোবার পরে নিষ্কৃতি। বলল, ওই হাত একবার জিভে লাগলেই ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যেত।

তৃতীয় সপ্তাহের গোড়ায় কলকাতা ফেরার কথা তুলতে রজত গাঙ্গুলি আর এক সপ্তাহ থেকে যাবার জন্যে জুলুম করতে লাগল। করবে জানত। লক্ষ্যের মোহনায় এসে পৌঁছতে পেরেছে মীনা। অনেকবার বলার পর একটা শর্ত দিল মীনা, বলল, আপত্তি নেই, যদি এক সপ্তাহ পরে আপনিও সঙ্গে যান। আপনার এখানে বসে বসে কি কাজ?

রাজি হয়ে গেল। ডবল আনন্দ যেন।

সেদিন আচমকা বিভ্রাট একটা।

বুকে অসহ্য ব্যথা উঠল ভদ্রলোকের। দেখতে দেখতে বিবর্ণ মুখ। ঘাম হচ্ছে। মীনা শুনল আগেও এক-আধবার এমন হয়েছে। এবার অনেকদিন বাদে হল। ব্যথা বাড়ছেই। ভয়ানক ঘাবড়ে গিয়ে মীনা তাড়াতাড়ি নম্বর নিয়ে তার সেই ডাক্তার বন্ধু যোশীকেই টেলিফোন করল।

কাছেই বাড়ি তার। দশ মিনিটের মধ্যে এসে গেল। ডাক্তার ঘরে ঢুকতেই রজত গাঙ্গুলি মাঝের হলঘর থেকে কাগজের প্যাড আর কলম এনে রাখতে বলল। মীনা ছুটে গিয়ে নিয়ে এলো।

ডাক্তার অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করে শেষ রায় দিল, যা ভেবেছিলাম তা নয়। তবে ব্যথাটার জন্যে এক্ষুনি ঘুমের ব্যবস্থা করা দরকার বটে। গোটাকতক ওষুধ লিখে আর অভয় দিয়ে ডাক্তার বিদায় নিল। আর এক জায়গায় জরুরী কল আছে তার।

ওষুধ আনিয়ে নির্দেশ মতো মীনাই সে-সব দিতে থাকল। ডাক্তার অভয় দিয়ে গেল বটে, কিন্তু কড়া ঘুমের ওষুধ পড়া সত্ত্বেও লোকটা সুস্থির ভাবে ঘুমোতে পারছে না লক্ষ্য করছে। আধো ঘুমের মধ্যে মাঝে মাঝে ছটফট করছে, আর বড় বড় চোখ মেলে মীনাকে দেখছে।

লোকটার মুখের দিকে চেয়ে অদ্ভুত মায়া হচ্ছে মীনার। এ-রকম কখনো হয়নি। শিয়রের কাছে বসে সে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

বিড়বিড় করে রজত গাঙ্গুলি বলল, আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি—

মীনা জোর দিয়ে বলল, কষ্ট আবার কি, এসেই জ্বর বাধিয়ে এর থেকে ঢের বেশী ভুগিয়েছি আমি।

ক্লান্তিতে চোখ বুজল।

দু'দিনের মধ্যে চাঙ্গা হয়ে উঠতে মীনা নিশ্চিন্ত। আবার তেমনি হৈ-চৈ করে বেড়ানোর ঝোঁক। নিষেধ করলেও শুনতে চায় না। মীনা ভ্রূকুটি করে বলে, সেদিন ব্যাপারখানা কেমন বাধিয়ে বসেছিলেন মনে আছে?

খুব। হাসে। বলে, কিছু হলে লোকসান নেই দেখলাম।

চতুর্থ সপ্তাহ এসে গেল।

আর চার পাঁচটা দিন কাটলে দুজনের একসঙ্গে কলকাতা রওনা হওয়ার কথা।

গাড়িটা পথে রেখে বন্দুক হাতে মীনাকে নিয়ে সেদিন রজত গাঙ্গুলি ডিপ ফরেস্টে ঢুকল। ডিপ ফরেস্ট বাড়ি থেকে কুড়ি-বাইশ মাইল পথ। আগেও এখানে এসেছে, কিন্তু ভিতরে ঢোকা হয়নি।

বেশ রোমাঞ্চ অনুভব করছিল মীনা। খানিক ঘোরাঘুরির পর একটা বড় গাছের নিচে বসল দুজনে। মীনা লক্ষ্য করল, সামনে বা দূর দিয়ে হরিণ ছোটাছুটি করলেও বন্দুক তুলছে না লোকটা।

এ-কথা সে-কথার ফাঁকে ফাঁকে শিকারের বদলে ওকেই যেন একটু বেশি লক্ষ্য করছে। ছোট ছেলের মতো সেই দুষ্টু দুষ্টু অথচ স্বচ্ছ চোখ।

মীনা বলল, কি হল, শিকার করবেন বলেছিলেন?

হাসছে।—করব। হাসছে।—আর একটু কাছ ঘেঁসে বসলে কি হয়?

শাসনের সুরে মীনা বলল, মোটেই ভাল হয় না।

বেশ কৌতুক ভরেই রজত গাঙ্গুলি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, আপনি আমাদের পারিবারিক কিছু জানেন?

মীনা সচকিত একটু! ঈষৎ বিস্ময়ে ফিরে জিজ্ঞাসা করল কি ব্যাপার?

মুখের হাসি আরো কাঁচা আরো মিষ্টি লাগছে।—যেমন ধরুন আমাদের অঢেল সম্পত্তি আর টাকা, অথচ সব কিছুর ট্রাস্টি আমার

কাকা সমর গাঙ্গুলি....আমার বৈমাত্রেয় ভাই কমল গাঙ্গুলি তার আট আনা ভাগের মধ্যে ছ'আনা পেয়ে গেছে—আমার ভাগের সবটাই এখনো কাকার হেপাজতে··· শুনেছেন ?

মীনা বলল, একটু-আধটু শুনেছিলাম। এ-ব্যবস্থা কেন বলুন তো ?

আমার জন্যে। যেন রসালো প্রসঙ্গই ফেঁদে বসেছে একটা। বলে গেল, জন্মের পরে মাকে হারিয়ে প্রথম দিকটা মামাবাড়িতে বড় হয়েছিলাম···আমার স্বভাব চরিত্র কেমন হবে গোড়া থেকেই সাত্ত্বিক দাদুর সন্দেহ ছিল। আমার বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই সন্দেহ আরো পাকা হয়েছে। দু-একটা বাজে মেয়ের সঙ্গে মেশার খবর তার কানে এসেছিল। আমার শিকারের নেশাও তার চক্ষুশূল। শেষে যখন টের পেল আমি ড্রিংক করা শুরু করেছি তখন বুড়ো ক্ষেপেই গেল। ততদিনে দ্বিতীয় মা মারা গেছে, আর নিজেরও একবার স্ট্রোক হয়ে গেছে। ব্যস, উইলে কড়া নির্দেশ দিয়ে গেল—যদি আমার চরিত্র সংশোধন না হয়, এমন কি যদি বে-জাতে বিয়ে করি, তাহলেও সম্পত্তির কানাকড়িও পাব না। সব কমল পাবে।····কাকা সমর গাঙ্গুলি যেদিন ভালো বুঝবে সমস্ত টাকা আর সম্পত্তি হয় দু' ভাইকে ভাগ করে দেবে, নয়তো শুধু কমলেরই সব পাওয়ার কথা, কারণ আমার স্বভাব মোটামুটি এক রকমই আছে। কিন্তু কাকা সমর গাঙ্গুলির আবার আমার ওপর দুর্বলতা আছে একটু। আমি অনেক শুধরে গেছি আরো শুধরে যাব এই আশাই করছে সে।···· কিন্তু আমাদের বিয়েটা হয়ে গেলে তার আর কোন হাত থাকবে না।

মীনা তার মুখের দিকে অপলক চেয়ে আছে। যা ভেবেছে তাই, বিয়েটা পাকা সিদ্ধান্ত ভেবে নিয়েছে এই লোক! তেমনি কাঁচা মিষ্টি মিষ্টি হাসি দেখছে মীনা। চেষ্টা করেও তার বউকে স্বজাতি ভাবতে পারবে না সমর গাঙ্গুলি এটাই কৌতুকের বিষয় যেন।

তেমনি হাসিমুখেই রজত গাঙ্গুলি চারদিকে তাকালো একবার। জঙ্গলের মধ্যে আলো এত কমে এসেছে মীনা খেয়াল করেনি! মনে

হয় সন্ধ্যা হয়ে এলো। পরিতুষ্ট মুখে রজত গাঙ্গুলি বলল, এ জঙ্গলে হায়েনা নেকড়ে আর ভালুক আছে অনেক।

মীনা চমকে উঠল একটু। বন্দুকটা ভদ্রলোকের পায়ের কাছে পড়ে আছে। ওতে টোটা ভরা আছে কিনা সন্দেহ। হেসেই বলল, ভয় দেখানো হচ্ছে ?

না, সত্যিই আছে। বুনো হাতিও আছে।

তাহলে আর বসে না থেকে উঠে পড়ুন চটপট।

চোখে চোখ রেখে হাসছে মিটিমিটি। বলল, ভাবছি, তোমাকে যদি এখানে ফেলে রেখে আমি গাড়ি নিয়ে চলে যাই ?

মীনা হতচকিত কয়েক মুহূর্ত। এই প্রথম 'তুমি' সম্ভাষণ। কিন্তু তবু হেসেই বলল, কেন, হায়েনা নেকড়ে ভালুক দিয়ে আমাকে খাওয়ানোর ইচ্ছে ?

উঠে দাঁড়াতে গেল। চোখের পলকে একটা হ্যাঁচকা টানে রজত গাঙ্গুলি বসিয়ে দিল তাকে। তারপর একেবারে বুকের কাছে টেনে এনে আসুরিক ঝাঁকুনি দিল গোটাকতক। মুহূর্তের মধ্যে অমন ছেলের একখানা মুখ এমন নৃশংস কঠিন হয়ে উঠতে পারে কি করে, আর ছোট ছেলের মতো দুটো চোখ এমন ঝলসে ওঠে কি করে মীনার কল্পনার অতীত।

এই আচমকা আঘাতে দেহের সমস্ত রক্ত যেন নিমেষে হিম তার।

দুই কাঁধ তখনো তার কঠিন দুটো থাবার মধ্যে ধরা। রাগে দু'চোখ ঝকমক করছে—শিকার দেখলে ? কি সুন্দর শিকার ? মুখের কাছে মুখ এগিয়ে এসেছে আরো—এত সুন্দর তবু কি করে যে চারটে সপ্তাহ লোভ সামলেছি আমিই জানি।

রুক্ষ হাতেই একটু ঠেলে সরিয়ে দিল ওকে। হাসতে লাগল দাঁতে দাঁত চেপে। এই হাসি একেবারে অন্য রকম। বলল, কলকাতায় গেলে আমাদের ভাব-সাব আরো বাড়বে—দু-একটা গোপন অ্যাপয়েন্টমেন্টও হবে—কেউ জানবে না—শুধু কমল জানবে আর তার মারফৎ কাকা সমর গাঙ্গুলি জানবে—এই তো ?

মীনা নিস্পন্দ, কাঠ।

তারপর বিয়ে। তার কিছুদিনের মধ্যে ডিভোর্স বা সেই রকমই কিছু। ততদিনে কমল গাঙ্গুলির হাতে আমার সমস্ত টাকা আর সম্পত্তি। তার থেকে এক লাখ....হয়তো বা আরো বেশি ভাগ তোমার।—এই তো ?

যে মাটিতে বসে আছে মীনা সেই মাটি দুলছে।

রজত গাঙ্গুলির দু'চোখ যেন ছুরির ফলার মতোই কেটে চলেছে ওকে। আবার ধরাশায়ী শিকার দেখে হাসছেও। তেমনি অনুচ্চ কঠিন সুরেই বলে গেল, এখানে দুজনের একসঙ্গে তোলা ছবিগুলোও —বিশেষ করে যে ছবিতে তুমি আমার গায়ের ওপর পড়ে গেছলে— সেই সব ছবিও কমলের হাত দিয়ে সমর গাঙ্গুলির হাতে পড়বে....আর চার সপ্তাহ ধরে তুমি আমার সঙ্গে এক বাড়িতে আছ সে প্রমাণ তো ইচ্ছে করলেই যে কেউ হাতের মুঠোয় পেতে পারে—কেমন ?

মীনা পাথর হয়ে যাচ্ছে।

হাসছে। সেই রকমই কঠিন হাসি। বলে চলেছে, আমার এই মুখ দেখে মাঝে মাঝে হিংস্র জানোয়ারও ভুল করে, তুমি ভুল করবে সে আর বেশি কি। যে মুহূর্তে তুমি হোটেলে না গিয়ে একলা অপরিচিত মানুষের সঙ্গে এক বাড়িতে থাকতে চাইলে তক্ষুনি আমি বুঝে নিয়েছি, তুমি কে—কে তোমাকে পাঠিয়েছে। আর, তুমি আমার স্ত্রীর খোঁজ করেছিলে এখানে আসার দেড় ঘণ্টা বাদে—তাই থেকে আরো বুঝেছি।...সেইদিনই বীরেনকে লিখেছিলাম, কমলের মক্ষীরানী তোমার চিঠি নিয়ে পৌঁছেছে। এটা ঠিক কি ধরনের রসিকতা বিস্তারিত জানাও, নয়তো আমাকে না আবার মেয়ে হত্যার দায়ে কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াতে হয়।...কমল ভেবেছে এক-লাখ দেড়-লাখের লোভ দেখালেই আমার বন্ধুকে হাত করা যায়, কিন্তু সে রকম বন্ধুত্ব আমি করি না। কমলের টোপ গেলার ভান করে উপকারই করতে চেয়েছে সে। কিন্তু আমার চিঠির জবাবে ও কোন কথা ভাঙেনি। চারদিন বাদে জবাব লিখেছে, কড়া পরীক্ষক তার প্রিয় ছাত্রকেও

কোশ্চেন বলে বলে দেয় না—নিজেই সামলাও।...পরে হয়তো সবই লিখত, তার আগে আমাকে সত্যি একটু যাচাই করে নেওয়ার লোভ হয়েছিল ওর। কমলের মক্ষারানীকে সে-ও একটা বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছিল.... বুঝতে কষ্ট হচ্ছে তোমার?

না, সত্যিই মানাকে জঙ্গলে ফেলে রেখে চলে যায়নি এরপর। ওর উঠে দাঁড়ানোরও শক্তি ছিল না, বাহু ধরে টেনে দাঁড় করিয়েছে। টেনে জঙ্গলের বাইরেও এনেছে। তারপর তেমনি রুক্ষ হাতে ঠেলে গাড়িতে তুলেছে।

থমথমে মুখে গাড়ি চালিয়েছে

মানা কি করবে! আচমকা দরজা খুলে ঝাঁপ দেবে আবার? নড়াচড়ারও ক্ষমতা নেই। নিস্পন্দ, কাঠ যেন।

....রাত্রিতে ওর ঘরে এলো। মীনা কলের পুতুলের মতো উঠে দাঁড়াল। কিন্তু এখন অন্য মূর্তি, অন্য মুখ। চোখের তারায় অন্তর্দৃষ্টি চিকচিক করছে। দু কাঁধে হাত রেখে ওর ভিতর সুদ্ধু দেখে নিতে চেষ্টা করল। তারপর শুকনো বিবর্ণ দু ঠোঁটের ওপর আলতো করে নিজের পুরু ঠোঁট দুটো একবার বুলিয়ে নিল।

....মানার মুখের দিকে চেয়ে ওই লোক ভিতর দেখতে পেয়েছে বোধহয়। ও যে পালাবার পথ খুঁজছে বুঝেছে। দুই কাঁধে একটা স্পর্শ শিরশির করে উঠল। ঠোঁটেও।

মুখ তোলো!

মীনা আবার মুখ তুলল। দুটো টানা চোখের গভীরে হারিয়ে যেতে লাগল। নিজের দুই হাঁটুর ওপরেও জোর কমে আসছে। কিন্তু এই অকরুণ দ্রষ্টার দেখা আর শেষ হবে না বুঝি।

…শেষ হল। চোখের তারায় আরো হাসি চিকচিক করছে।
অকরুণ অন্তর্দৃষ্টি ছাড়া আর কি হতে পারে? দণ্ডমুণ্ডের মালিকের মতোই ভারী গলায় বলল, শাস্তি পেতে যারা ডরায় তাদের আমি ঘৃণা করি—এখান থেকে পালাতে চেষ্টা কোরো না, তাতে কোন লাভ হবে না, পুলিশে একটা ফোন করে দিলে কাছাকাছি কোন স্টেশানেই ধরা পড়বে—আর ট্রেন থেকে তোমাকে নামিয়ে আমাকে তারা খবর দেবে।

মীনা নির্বাক দাঁড়িয়ে।

ঘর ছেড়ে যাবার আগে আবার ঘুরে দাঁড়াল রজত গাঙ্গুলি।—ছুটো দিন সবুর কর, আমার ভাবতে বেশি সময় লাগবে না।

অর্থাৎ দু'দিনের মধ্যে মীনার বিচার হয়ে যাবে।

…হ্যাঁ, নিজেকে তখনো বুদ্ধিমতী ভেবেছে মীনা। কিন্তু নিতান্ত বোকা বলেই বিচারের রায় কি হবে ভাবতে পারেনি। ঠোঁটের ওই স্পর্শটুকু তাকে ভুল বিবেচনার পথে ঠেলে দিয়েছিল। পুরুষের লোভ তার জানা আছে। ওই প্রবল পুরুষও সেই লোভের বলি হবে এমন সম্ভাবনা তার মনের কোণে উঁকিঝুঁকি দিয়েছিল। তারপর ওকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে সেই লোভের দাগ মুছে ফেলতে চাইবে হয়তো। তাই ছুটো দিন মীনা অপেক্ষা করতে পেরেছিল। চূড়ান্ত কিছু ঘটার আগে এই ভয়ঙ্কর মানুষকে সাময়িক ভাবে অন্তত বশীভূত করার ফাঁকে বাঁচার রাস্তা করে নিতে পারে কিনা, সেই আশাটুকুই সম্বল তখন।

কিন্তু মানুষ চিনতে মীনার আবারও ভুল হয়েছে।

তৃতীয় দিন সন্ধ্যার দিকে রজত গাঙ্গুলি সামনে এসে দাঁড়াল। সেই হাসি-হাসি দুষ্টু-দুষ্টু চোখ। বলল, ভাবা হয়েছে। আমিও তোমার থেকে কম বেপরোয়া নই—তুমি মক্ষীরানী ছিলে, এবারে শুধু রানী হতে পারো কিনা আদা জল খেয়ে চেষ্টা করে দেখি।

মীনা চুপচাপ চেয়ে আছে। ওই হাসির আড়ালে হিংস্র মূর্তিটা আঁচ করতে চেষ্টা করছে।

হাসতে লাগল। বলে গেল, সব জেনেও তোমাকে আমি একটু পরীক্ষা করেছিলাম।...নিরাপদে আমাকে যমের বাড়ি পাঠাতে পারলেও কমল তোমাকে ডবল টাকা দেবে জেনেও তুমি সে-সুযোগ নিলে না দেখলাম। তোমাকে বিষ ফুলের গাছ দেখিয়েছিলাম, চামড়া পালিশ করার অছিলায় বিষের আরকের শিশি দেখিয়েছিলাম, আর তারপর শেষ সুযোগ দেবার জন্যে বুকের ব্যথা তুলে আধা-অজ্ঞান হয়ে মটকা মেরে পড়েছিলাম।...অবশ্য ওগুলোর একটাও বিষ নয়, কিন্তু তুমি তো বিষই জানতে। অমন সুযোগ পেয়েও উতলা হয়ে সেবাই করে গেলে দেখলাম। আর তারপর থেকে যত দেখেছি, মক্ষীরানীকে রানী বানাবার ঝোঁক আমার তত বেড়েছে। এই দুটো দিনও পরখ করলাম তোমাকে। যাক শোন, বীরেন আর কাকার সঙ্গে আমার ফয়সলা হয়ে গেছে, আমি নিজে মন্দ তাই বেশি ভালোর ধার ধারি না—একটা মন্দ মেয়েকেই নিলাম। সম্পত্তি চুলোয় যাক, আপাতত যে-সম্পত্তিটি হাতে পেয়েছি তাকেই একটু নেড়েচেড়ে দেখি কোথায় পৌঁছই।

কাছে এলো। দুই কাঁধে হাত রাখল। পুরু অধর আবার আলতো করে মীনার ঠোঁট দুটো ছুঁয়ে গেল। এবার মীনা কাঁপছে। থরথর করে। মাটি কাঁপছে। পৃথিবী কাঁপছে। সৃষ্টি কাঁপছে।

একটু বাদে রজত গাঙ্গুলি এখানকার এক পরিচিত শিকারী বন্ধুর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেল। যাবার আগে হাসিমুখেই বলল, না গিয়ে উপায় নেই, খুব ধরেছে। লক্ষ্মী মেয়ের মতো ঘরে বসে থাকো, ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই আসছি।

চলে গেছে। স্নিগ্ধ হাসি মাখা দু চোখ ওর সমস্ত মুখে বুলিয়ে দিয়ে গেছে।

....এই দু'ঘণ্টা সময় মীনার কাছে কি সেটা এক ও ছাড়া দুনিয়ায় কেউ কল্পনা করতে পারবে না। জীবন আর মৃত্যুর মাঝের ফারাকটুকুর মতো। কিন্তু মীনা এখন জীবনের পথে ছুটবে কি মৃত্যুর আঁধারে ঝাঁপ দিতে ?

মীনা জানে না। শুধু জানে, এ দু'ঘণ্টার মতো দুর্লভ সময় আর হয় না।

রজত গাঙ্গুলি বেরিয়ে যাবার দশ মিনিটের মধ্যে মীনা নিঃশব্দে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়েছে। চিমনলাল তখন কিচেনে তার খাবার বানাতে ব্যস্ত।

....ট্যাক্সি-স্ট্যাণ্ড বেশি দূরে নয়। প্রায় সবগুলি ট্যাক্সিরই শিখ ড্রাইভার। তাই ভালো। দীর্ঘ পথ মুখ বুজে চলার পক্ষে সুবিধে। সেদিন পালাবার প্রসঙ্গে ও-ভাবে শাসিয়ে কত উপকার করেছে রজত গাঙ্গুলি জানে না। নইলে বোকার মতো মীনা ট্রেনেই পালাবার মতলব আঁটত।

একজন বুড়ো ড্রাইভারকে বেছে নিল। তাকে জানাল রাত এগারোটা থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যে তাকে হরিদ্বার যেতে হবে, টেলিগ্রামে একজন নিকট আত্মীয়ের বিশেষ অসুখের খবর এসেছে।

একেলি জায়েঙ্গী ?

ভয় ডর সব কেটে গেছে মীনার, এখন শুধু পালাবার তাড়া। জবাব দিল, রাত এগারোটা থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যে একজনের আসার কথা, এলে দুজনে যাবে, না এলে একলাই যাবে।

সুন্দর মুখ, বিপন্ন মুখ—অবিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। মুখের দিকে চেয়ে লোকটা কি দর হাঁকবে ভেবেছে। এদিকের কোন ট্যাক্সিতে মিটারের বালাই নেই, দূর বুঝে দর। একশো পঁচিশ টাকা চাইল।

পঁয়তাল্লিশ মাইল পথ। তবু একটি কথাও না বলে মীনা তার হাতে আগাম কুড়ি টাকা দিয়ে দ্রুত ফিরে চলল।....এই লোকের কাছ থেকে আরো অনেক অনেক দূরে পালাতে না পারলে নিরাপদ

ভাবছে না। সম্ভব হলে হরিদ্বার থেকে ট্যাক্সি বদলে এই রাতেই আবার একদিকে চলে যাবে।

....সাগর পারের এক অতি সাধারণ মেয়ের জন্যে রাজার দুলাল রাজমুকুট ছুড়ে ফেলে দিয়ে সেই সাধারণ মেয়ের হাত ধরার গল্প শুনেছিল মীনা। সেই মেয়ে ভাগ্যবতী। কিন্তু তার থেকেও ঢের সাধারণ নরক দেখা মেয়ের মাথায় ওই গোছের ভাগ্যের শিকে ছিঁড়তে দেখলে সে কি করে? কি করে মীনা জানে না। সে জানে, তাকে পালাতে হবে ছুটতে হবে। ছোটার এমন তাড়না এই সাতাশ বছর বয়সের মধ্যে আর কখনো অনুভব করেনি।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই যেমন বেরিয়েছিল তেমনি নিঃশব্দে ফিরে এসেছে আবার।

রজত গাঙ্গুলি তাকে লক্ষ্মী মেয়ের মতো ঘরে বসে থাকতে বলেছিল—ফিরে এসে তাই দেখেছে।

সামনে এসে দাঁড়াতেই একটা চেনা গন্ধ নাকে এসেছে মীনার। মনের অবস্থা ভুলে একটু বিস্মিত চোখেই তাকিয়েছিল তার দিকে। তাইতেই বুঝেছে। ঈষৎ অপ্রতিভ মুখে হেসেই বলেছে, ব্যাটা আমাকে ছাইভস্ম গিলিয়ে ছেড়েছে, অনেক দিন অভ্যেস নেই তাই অল্পেতেই ধরে গেল।

মীনা চেয়েই ছিল। হাসিমাখা দু'চোখ তার মুখের ওপর আটকে রইল একটু। তারপর বলল, বেজায় ঘুম পাচ্ছে, শুয়ে পড়িগে, কাল কথা হবে...অনেক কথা...কেমন? ভালো কথা, তুমি খেয়ে নিয়েছ তো?

মীনা মাথা নেড়েছে।

আচ্ছা, গুড নাইট। চলে গেল।

মীনা ঈশ্বরকে কোনদিন ডাকেনি। মনে মনে কাকে ধন্যবাদ দিল জানে না। নিজের ভাগ্যকেও হতে পারে। এই এক রাত লোকটা অঘোরে ঘুমোক এর থেকে বেশী কাম্য আর বোধহয় কিছু ছিল না। সেই ঘুমের ব্যবস্থা নিজেই করে এসেছে।

কিন্তু তাতেও মীনা নিশ্চিন্ত বোধ করেনি খুব। ওর মুখ দেখে ওই লোকের মনের অগোচরেও যদি কোন খটকা লেগে থাকে গাঢ় ঘুমের মধ্যেও সচকিত হয়ে উঠতে পারে। তাড়াহুড়ো করবে না আর। আরো কম করে একটা ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে।

....চিমন কিচেনের পাশের খুপরিতে শোয়। অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছে। সে ঘুমুলে কুম্ভকর্ণ। নিচের ফটকে একটা শেকল লাগানো থাকে শুধু। চুরির প্রসঙ্গ উঠতে রজত গাঙ্গুলি বলেছিল, এখানে ওসব নেই। তাছাড়া আমার বন্দুকের খবর আর নিশানার খবর এ তল্লাটে কে না রাখে।

যেন কত কালের এক স্তব্ধ প্রতীক্ষা। তারপর রাত এগারোটা বাজল এক সময়। স্যুটকেস হাতে তুলে নিল। সেই থেকে ঘর অন্ধকার, একবারও আলো জ্বালেনি। অন্ধকারে পা টিপে নিচে নেমে এলো। একটুও শব্দ না করে বাইরের দরজা খুলল।

এক পা দু'পা করে ফটকের সামনে এসে দাঁড়াল।

তারপর বুকের একেবারে মধ্যিখানে প্রচণ্ড আঘাত একটা।

গেটের শিকলে বড় তালা ঝুলছে।

মীনা কি করবে এখন? চিৎকার করে আকাশটাকে বিদীর্ণ করে দেবে? স্যুটকেস মাটিতে ফেলে পাগলের মতই তালা ধরে টানাটানি করতে লাগল।

কাঁধে হাত পড়তে বিষম চমকে ঘুরে তাকালো। হ্যাঁ সে। সেই লোক। নির্মল হাসছে। দাঁতের আভাস চিকচিক করছে। মীনা ছিটকে সরে যেতে চেয়েও পারল না। চোখ দিয়ে আর মুখ দিয়ে জ্বলন্ত আগুন ঠিকরলো তার।—ছেড়ে দিন! ছেড়ে দিন আমাকে! তালা খুলে দিন! আমাকে যেতে দিন!

জবাবে রজত গাঙ্গুলি আরো সবলে বুকে আগলে ধরতে চেষ্টা করল তাকে। মীনার ছিটকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা। পাগলের মতই আঁচড়ে খামচে নিজেকে ছাড়াতে চেষ্টা করছে সে।—ছাড়ুন! ছেড়ে দিন! আমাকে যেতে দিন! নইলে চিৎকার করব—ছাড়ুন বলছি!

আটকে গেল। আচমকা নিজের মুখ দিয়েই সে ওর মুখ বন্ধ করল। চোখের পলকে ওকে তুলে বুকের সঙ্গে জাপটে ধরে এক মিনিটের মধ্যে সিঁড়ি টপকে সোজা দোতলায়। মীনা তখনো দিশেহারার মতই নিজেকে ছাড়াবার জন্যে ছটফট করছে। কিন্তু মুখ দিয়ে মুখ আটকানো, সমস্ত দেহ শূন্যে।

ধুপ করে নিজের শয্যায় এনে ফেলল ওকে। এই শরীর স্বাস্থ্য মীনার, ফলে হাঁপাচ্ছে। সেই সঙ্গে হাসছেও। আগে ঘরের দরজা বন্ধ করল।

তখনো ক্ষিপ্ত দিশেহারা মীনা। খাট থেকে নেমে এলো। বিস্রস্ত বসন, কিন্তু হুঁশ নেই। দরজা খোলার চেষ্টা।—আমাকে ছেড়ে দিন, আমাকে যেতে দিন—

শক্ত হাতে তাকে টেনে এনে ঘরের মাঝখানে দাঁড় করালো রজত গাঙ্গুলি। বলল, দেব। তার আগে আমার ক'টা কথা শুনতে হবে।

মীনা অস্বাভাবিক চোখেই থমকে তাকাল।

রজত গাঙ্গুলি ঠাণ্ডা মুখে বলে গেল, তোমাকে এই শেষ পরীক্ষাটুকু করার লোভও আমি ছাড়তে পারিনি। আমার কোথাও নেমন্তন্ন ছিল না, আর যা ভেবেছ তা সত্যিই আমি খাইনি। তুমি যখন ট্যাক্সি ঠিক করে এলে তখন আমি তোমার তিরিশ গজের মধ্যেই দাঁড়িয়ে ছিলাম।

তেমনি অধীর অথচ বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে আছে মীনা।

রজত গাঙ্গুলির গলার স্বর অদ্ভুত কোমল এবার।—আমার মন বলছিল, যদি তুমি সত্যিই আমাকে ভালবেসে থাকো তাহলে এবার পালাবে। তোমার অতীতকে নিজেই তুমি বরদাস্ত করতে চাইবে না, তাই পালাবে। এই শেষ পরীক্ষাটুকুর লোভ তাই সত্যি আমি ছাড়তে পারিনি।

দু'হাতে মুখ ঢেকে সবেগে মাথা নাড়ল মীনা, আর্ত স্বরে বলে উঠল, না না, আমাকে যেতে দিন, আপনি জানেন না আমি কত খারাপ—

তুমি খুব ভালো, কত ভালো, তা তুমি নিজেই জানো না; তোমার ওই অতীতের কোন দাম নেই আমার কাছে, তুমি এখন যা আমি শুধু সেটুকুই দেখছি, সেটুকুই নিচ্ছি।

তখনো সবেগে মাথা নেড়ে ডুকরে উঠছে মীনা, আমাকে ছেড়ে দিন, আমাকে যেতে দিন!

ঠিক আছে, যাবে। চিমনকেও বলব গেট খুলে দিতে। কিন্তু রাত পোহালে খবরের কাগজে দেখবে, রজত গাঙ্গুলি নামে এক নিঃসঙ্গ শিকারী নিজের কপালে বন্দুক ঠেকিয়ে শেষ শিকার করেছে। বুঝতে পারছ আমার কথা?

মুখ থেকে হাত সরিয়ে বিষম চমকে তাকালো মীনা। বেদনার্ত মুখ।

চুপচাপ রজত গাঙ্গুলি ওকে বুকে ধরে থাকল খানিক। তারও দু'চোখ চিকচিক করছে। বলল, ভুল বড় হলে তার ফসলও বড়ই হয় মীনা। আমার কাকাকে কত ভুল বুঝেছ নিজেই ভেবে দেখো।

এক হাতে ধরে রেখেছে ওকে, অন্য হাতে বুকপকেট থেকে চিঠি বার করল একটা।—পরশু অনেকক্ষণ কাকার সঙ্গে ট্রাঙ্ক টেলিফোনে কথা হয়েছে আমার। আজ সকালে এই চিঠি এসেছে। চিঠিটা ঝাড়া দিয়ে ভাঁজ খুলল।—গোড়ার দিকে কাকা আশীর্বাদ করেছেন আমাদের। লিখেছেন দাদুর হুকুমের খেলাপ হবে না, সেদিক থেকে আমাদের কিছু প্রাপ্য নেই—কিন্তু কাকার সব কিছু আমাদের দুজনের নামে উইল করে দিচ্ছেন। সে যাক, এই শেষটুকু তোমার জন্যে, এটুকু নিজে পড়তে হবে তোমাকে—শেষের এখান থেকে পড়—

স্পষ্ট সুন্দর লেখা, কিন্তু মীনা পড়ে উঠতে পারছে না। ঝাপসা দেখছে চোখে। বুক কাঁপছে। পায়ের নিচে মাটি দুলছে।

—বীরেনের কাছে শুনলাম, আমার ওপরেই সব থেকে বেশি রাগ আর ঘৃণা নিয়েই মীনা মা তোমার কাছে ছুটে গেছে। মৃত্যুর আগে ওর মায়ের অনুরোধ ছিল, মেয়েটাকে যেন আমি দেখি। যেটুকু সম্ভব চেষ্টা করেছি।...সে কিছুই নয়। তবে একটা কথা তাকে

বোলো, ভালবাসা সত্ত্বেও আমরা অভিভাবকদের আঘাত দিতে চাইনি বলেই আমরা দূরে সরে গেছলাম। কিন্তু ওর মা যার হাতে পড়েছিল, তাঁর নির্যাতন ও কল্পনা করতে পারবে না। মদে আর রেসে সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন ভদ্রলোক, তার ওপর সন্দেহ আর নির্যাতন। শেষে যখন শুনলাম, ওর মায়ের নামে পঞ্চাশ হাজার টাকার লাইফ ইন্‌সিওরেন্স করে তাকে চিরদিনের মতো সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছেন—তখন আর কারো মুখের দিকে না তাকিয়ে সত্যি আমি তাকে ছিনিয়ে এনেছিলাম। সেজন্যে এতটুকু পাপবোধ কোনদিন ওর মাকে স্পর্শ করেনি। পরস্পরকে ভালবেসে নিজেদের মনের কাছে আমরা উত্তীর্ণ হতে পেরেছি। তার জন্যে হাসিমুখেই আমার বাবার দেওয়া শাস্তি মাথা পেতে নিতে পেরেছি। এখন মীনার কাছেও যদি কেবল ঘৃণাটুকুই প্রাপ্য হয় আমার তাও মাথা পেতে নেব। শুধু, সে যেন সর্বান্তকরণে তোমাকে গ্রহণ করতে পারে।

....মা-গো! চিঠিটা পড়ে গেল হাত থেকে।

কি এক অদম্য আবেগে নিজেও পড়েই যাচ্ছিল বুঝি। এই বাড়ি, এই ঘর, ঘরের এই বাতাস, বুকের তলার যত জানা আর অজানা ঢেউ—সব কিছু দুলছে ফুলছে—কি যে হচ্ছে বুঝতে পারছে না।

....কিন্তু না। পড়ে যাচ্ছে না।

চোখ টান করে তাকালো। দুটো হাতের সবল বেষ্টনীর এক নিশ্চিত নিরাপদ আশ্রয়েই দাঁড়িয়ে আছে মীনা।